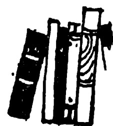
প্রথম সংস্করণ
৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬২

দু টাকা

প্রচ্ছদসজ্জা ঃ
অজিত গুপ্ত

প্রকাশক ঃ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বি. এ.
৯৩, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা ৭

মুদ্রাকর ঃ শ্রীত্রিদিবেশ বসু, বি. এ.
কে. পি. বসু প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১১, মহেন্দ্র গোস্বামী লেন, কলিকাতা ৬







যস্মিন দেশে

বিখ্যাত চৈনিক লেখক ও দার্শনিক লিন য়ুটাং যখন প্রথম আমেরিকায় পদার্পণ করেন তখন সাংবাদিকরা তাকে জিজ্ঞাসা করল ও দেশের কোন জিনিসটা তার চোখে ঠেকছে সবচেয়ে বেশী। তিনি উত্তর দিলেন, "আমেরিকানদের চোখের বাঁকা টান।" এই পরিহাসের দার্শনিক মর্ম অবশ্য এই যে পশ্চিমের চোখে যেমন মংগোলীয় চোখের রেখা অস্বাভাবিক, চীন জাপানের চোখে সেখানে সত্যের আপেক্ষিক চেহারাটা ঠিক তার বিপরীত।

চেহারা ছাড়া অবশ্য দেশ ও জাতির মধ্যে আছে আরো নানা রকমের পার্থক্য, যদিও নাক চোখের গঠন, গায়ের রং ইত্যাদির থেকেই বিভেদের সংস্কার জন্মায় সবচেয়ে সহজে। এর কারণটা ভৌগোলিক, সেখানে আমাদের হাত নেই। কিন্তু আন্তর্জাতিক বিভেদই বলি আর জাতিগত বৈশিষ্ট্যই বলি মানুষের চেহারার পরেই বোধহয় তা গড়ে ওঠে সামাজিক আচার আচরণকে আশ্রয় করে—এবং সেখানে আমাদের হাত আছে বিশেষ রকম; এমন কি একথা বললেও ভুল হয়না যে তার সবটাই কৃত্রিম ও মানুষের হাতে গড়া। আচার ব্যবহার আদব কায়দার পিছনে কখনো কখনো যুক্তি বা রুচির সমর্থন মেলে বটে, কিন্তু দেশে দেশে আবার অসঙ্গতি ও অর্থহীন কৃত্রিমতাও এত চোখে পড়ে যে ভেবে দেখলে তা প্রায় হাস্যকর।

পাশ্চাত্যের পুরুষ যখন জুতো মোজা শার্ট টাই ভূষিত হয়ে শুধু কোটটি খুলে রেখে বসেছে তখন কোনো মহিলা কাছাকাছি এলে তৎক্ষণাৎ কোট পরে উঠে দাঁড়াবে। পাশ্চাত্যের মেয়ে

শোবার পোশাকে কারো সামনে পড়লে তাড়াতাড়ি রোব চাপাবে তার উপরে, যদিও গলা থেকে গোড়ালি পর্যন্ত তার ঢাকাই ছিল। অথচ পুরুষ মেয়ে দুইই সমুদ্রতীরে প্রখর রৌদ্রালোকে অগণিত অপরিচিত জনতার সামনে সামান্য সাঁতারের সজ্জায় কোনো লজ্জা বোধ করবে না।

আমাদের দেশে যেমন নববিবাহিত বধ্ গুরুজনের সামনে অত্যন্ত প্রয়োজনেও মুখ খুলবে না, কিন্তু গান করতে বললে ঘোমটার আড়াল থেকে এমন চীৎকার করবে যে পানের দোকানের লাউডস্পিকার হার মানবে তার কাছে। আত্মীয় বিয়োগেও হিন্দু স্ত্রীলোকের এই ধরণের স্বাধীনতা আছে, এমন কি পল্লীর অপর প্রান্ত থেকে তার গলা শুনতে না পেলে অনেক প্রতিবেশীর মনে সন্দেহ জাগবে যে শোকটা সত্যিই আন্তরিক না লোক-দেখানো মাত্র।

অনেক সময় অর্থহীন হলেও রীতিনীতির সামাজিক প্রভাব কিন্তু গুরুতর। বাইরের জিনিস বলেই সহজে তা লোকের চোখে পড়ে এবং অপরের সম্বন্ধে মতামত গড়ে তোলে। সেই কারণে বিদেশে আমরা বিশেষ সাবধান অনুকরণে। বিলেতে যেতে হলে দেশেই অবশ্য ছুরি কাঁটার ব্যবহার শিখি, জাহাজ থেকে নামার আগে হয়তো এও জানা হয়ে যায় যে ঢেকুর তোলা বারণ, সর্বসমক্ষে গা চুলকানো দোষণীয়, এবং চীৎকার করে কথা বলা সভ্যতার পরিচায়ক নয়। অবশ্য কারো কারো মগ্নচেতনায় চাপা থাকে প্রতিবাদ—আমাদের পূর্বপুরুষরা চিরদিন ঢেকুর তুলেছে, গা চুলকেছে, চীৎকার করেছে—এবং কে না জানে তাঁরা যখন উপনিষদ রচনা করছিলেন তখন ইংলণ্ডের লোক ছিল বর্বর বনমানুষ!

আসলে আমরা ওদের চেয়ে অনেক বেশী সাবলীল ও স্বাভাবিক। যেমন লোকের সঙ্গে আলাপ আমাদের সমাজে কত সহজ! অনেক

সময় অপরিচিত ব্যক্তির নাম জানার আগেই আমরা তাকে জিজ্ঞাসা করি কটি ছেলেপুলে, তারা মায়ের মত দেখতে না বাপের মত, তিনি স্ত্রীকে ভালবাসেন কিনা, কত মাইনে পান, ইত্যাদি সরল দিলখোলা ঘরোয়া প্রশ্ন। পশ্চিমের লোক এই ব্যবহারে বিস্ময়ে ও রাগে প্রায় মূর্ছা যাবে, এমন কি দুটো চড়ও বসিয়ে দিতে পারে। অপর ব্যক্তিকে ভাইয়ের চোখে দেখতে তারা কোনোদিন শেখে নি তাই তারা বোঝে না যে ঐ সব অন্তরঙ্গ প্রশ্নে অলস অশুদ্ধ কৌতূহলের চিহ্নমাত্র নেই, স্বাভাবিক আত্মীয়তা ছাড়া তা আর কিছু নয়। আমেরিকানরা তবু আমাদের আদর্শের দিকে একটুখানি এগোতে পেরেছে, নতুন পরিচয়ের মাত্র দিন সাতেকের মধ্যে তারা নাম ধরে ডাকতে পারে, যেখানে ইংরেজের প্রায় সারা জীবন লেগে যায়।

আমেরিকানরা খাবার নিয়মেও প্রগতির পথ দেখিয়েছে ইংরেজী আইন উল্টে দিয়ে। ওরা কাঁটা ধরে ডান হাতে আর ছুরিকে প্রায় বাদই দিয়েছে। ইংরেজ কাঁটাকে কোদালের মত ব্যবহার করে দেখে ওরা হেসে খুন হয়—পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে যে ঐ যন্ত্রটা তৈরি হয়েছে ছুরির কাজ করার জন্যই। পশ্চিমের এই ধরণের গৃহবিবাদে মাঝখান থেকে আমাদের মত ম্লেচ্ছ শিক্ষার্থীদের বিপদ বাড়ে। নতুন করে শিখতে হয় যে দেশের যদাচার।

আবার এদিকে দেখি শ্বেতাঙ্গ ব্যক্তির একথা ভেবে কিছুতেই বিস্ময় বাগ মানে না যে দুনিয়ায় এমন জাতও আছে যারা খাবার জন্য আঙুল ব্যবহার করে। তখন এ কথা বলতে ইচ্ছা হয় যে ঈশ্বর যে মানুষকে হাতের ডগায় ঐ পাঁচটি লম্বা লম্বা প্রত্যঙ্গ দিয়েছেন তা শুধুমাত্র আংটি পরার জন্য হয়তো নয়। ওছাড়াও বন্দুকের ঘোড়া টেপা, সিগারেট ধরে রাখা, নখে রং লাগাতে

পারা ইত্যাদির জন্যই যে আঙুল প্রধানত তৈরি হয়েছে তা অবশ্য জলের মত পরিষ্কার, কিন্তু তবু তাদের সাহায্যে এক টুকরো খাবার তুলে যদি মুখে পোরা যায় তবে সেটা বোধহয় অমার্জনীয় অস্বাভাবিকতা হবে না। অবশ্য কাঁটা দিয়ে ঐ কাজটা করা যে অনেক সহজ তা সকলেই স্বীকার করতে বাধ্য—এক হয়তো চীনেরা ছাড়া, যারা কাঠি দিয়ে ভাত খায়।

বৈজ্ঞানিকরা বলেন ঘাড় বাড়িয়ে গাছের পাতা খেতে খেতে জিরাফের গলার আজ এই অবস্থা। তাই যদি হয় তবে নিশ্চয় একদিন ছুরি কাঁটা হাতে নিয়ে পাশ্চাত্য দেশে মানুষের শিশু জন্মাবে। রুপোর চামচে মুখে নিয়ে জন্মানোর কথা তো এরই মধ্যে ইংরেজী প্রবাদে পরিণত হয়েছে। আশ্চর্য দূরদর্শিতা ইংরেজের!

টেবিলের বা পোশাকের আদব কায়দা মোটামুটি সোজা, কিন্তু সমাজের স্তরে স্তরে আছে আরো অনেক জটিল ঘোরালো রীতিনীতি, যার ফলে পাশ্চাত্য জগতে সুসম্পূর্ণ সামাজিক জীব হয়ে ওঠা এক মস্ত বড় ললিতকলা। অনেকে দেহমনের সমস্ত শক্তি নিযুক্ত করেন এই আর্টের চর্চায়, অনেক সম্ভ্রান্ত মহিলার তা জীবনের ব্রত। সর্বদা ঠিক কথাটি বলে, ওজন করে হেসে, ছাঁচে ঢালা ব্যবহারের পথে এরা সংস্কৃতির শিরোমণি হয়ে ওঠেন।

বলা বাহুল্য, এ জিনিস আয়ত্ত করা বাইরের লোকের পক্ষে একেবারেই সহজ নয়। এক ভারতীয় ছাত্র একদা বিলেতে পা দিয়েই খুঁজে খুঁজে আদব কায়দা সম্বন্ধে বাজারের সবচেয়ে ভারি বইখানা কিনেছিল। ছেলেটি রসায়নের ছাত্র, কিন্তু তার বাপের মস্ত পরিতাপ যে বিলেত যাবার নেশার তুলনায় রসায়নের প্রতি উৎসাহ তার নিতান্তই দুর্বল। সবচেয়ে বড় উচ্চাশা তার ছিল যে আচারে ব্যবহারে নিখুঁত সাহেব হবে। কদিন ধরে সে গভীর মনোযোগে

পড়ে চলল ব্যবহার শাস্ত্র : ডিনারের নিমন্ত্রণ পেলে আগে এবং পরে কি লিখতে হবে ; পরিচয়পত্র নিয়ে কারো সঙ্গে দেখা করতে হলে তার বাড়িতে যাবে না আপিশে ; কোনো গৃহে দুর্ঘটনা এলে সমবেদনার জন্য চিঠি লিখবে না বাড়িতে যাবে, বাড়িতে গেলে দেখা করবে না কার্ড রেখে আসবে, কার্ড রেখে এলে তার উপরে কিছু লিখবে কিনা ; স্ত্রীলোক আর পুরুষের ক্ষেত্রে রীতি কোথায় কোথায় বিভিন্ন ; ড্রয়িংরুমে বসে কি কথা বলবে, কি করে বুঝবে ওদের খাওয়ার সময়ে এসে পড়েছে কিনা, এসে পড়ে থাকলে গৃহকর্ত্রী যদি নিমন্ত্রণ জানায় খেয়ে যেতে তবে সেই মূর্তিমতী আতিথেয়তার দিকে চেয়ে কি করে আন্দাজ করবে তার অন্তরের কথাটা কি।

কিছু দিন প্রাণপণ ব্যবহারকোষ অধ্যয়নের পর হঠাৎ একদিন তার মনে হল যে এর চেয়ে বোধহয় রসায়নের তথ্য মুখস্থ রাখা সহজ। তাই, ঈথার অ্যালকহল এস্টার কিটোন ইত্যাদির সমাজে পরস্পরের সংযোগে কে কি করবে তাতে মনোনিবেশ করে যথাসময়ে উপাধিভূষিত হয়ে সে প্রসন্ন পিতার গৃহে ফিরে এল।

আজকাল অবশ্য আচার-নিষ্ঠায় কিছু কিছু ভাঙন ধরেছে সব দেশে, সংস্কার সংস্কৃত হয়ে উঠছে যুগের হাওয়ায়। আমাদেরও 'পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণ করিলাম' এই বাঁধা গতের পাশাপাশি প্রায়ই দেখা যাচ্ছে 'ভাই পেলব, আমার বিয়ে, তোমার আসা চাইই'। এক কালে ইংরেজের আদর্শ ছিল যে আফ্রিকার জঙ্গলে বা প্রশান্ত মহাসাগরের অজ্ঞাত দ্বীপে যেখানেই সে থাকুক, এবং যদি তার একশো মাইলের মধ্যে দ্বিতীয় শ্বেতাঙ্গ ব্যক্তি নাও থাকে, এবং যদি গরম পড়ে একশো কুড়ি ডিগ্রিও, তবু কড়া কলারযুক্ত কামিজের উপর ডিনার স্যুট না চাপিয়ে সে কখনো খেতে বসবে না যতদিন তার দেহে সত্যিকারের ইংরেজী রক্ত একবিন্দু থাকে। এখন মাঝে মাঝে তার পরনে

হাওয়াই শার্টও দেখা যায়। এ যুগের ইংরেজ দম্পতি হয়তো বছর পনের একত্র বাস করে ন মাসে ছ মাসে এক আধবার ভুলে যায় সব কিছুর পরে পরস্পরকে ধন্যবাদ জানাতে।

তাবলে একথা মনে করা ভুল হবে যে ব্যবহার শাস্ত্রে পণ্ডিত হবার প্রয়োজন আর নেই। বরং সমাজে মিশতে গেলে ঐ ধরণের একটি অভিধান যে এখনো প্রায় অপরিহার্য তার জ্বলন্ত প্রমাণ একবার আমি পেয়েছিলাম। বছরে যে তিন চার দিন রোদ ওঠে লণ্ডনে তার এক অপরাহ্নে এক বান্ধবীর সঙ্গে রাস্তায় বেড়াচ্ছি। দিনটা এত চমৎকার যে হেঁটে বেড়াতেই ভাল লাগছিল দুজনের। কিন্তু ক্রমশ দেখা গেল বসন্তের হাওয়ার সঙ্গে আড়ি করেই যেন সঙ্গিনীর মুখে মেঘ ঘনিয়ে উঠছে। আমার নানারকম চেষ্টা সত্ত্বেও বাক্যালাপ ক্রমেই সংক্ষিপ্ত হয়ে এল, বুঝলাম কোথাও সাংঘাতিক গলদ একটা কিছু ঘটেছে, যদিও কি হয়েছে জিজ্ঞাসা করে জানা গেল 'কিছু না'। ডিনার হয়ে দাঁড়াল নিঃশব্দ কষ্টসাধ্য গলাধঃকরণ। অবশেষে বিদায় নিয়ে ছুটে গেলাম অভিজ্ঞ এক বন্ধুর ঘরে। কাতর বিবৃতি শেষ করে তাকে বললাম, "শুধু রাস্তায় বেড়ানোর মধ্যে কি যে দোষ করে থাকতে পারি তা তো বুঝতে পারছি না। ঐ যে 'দেবা ন জানন্তি' না কি যে বলে স্ত্রী-চরিত্র সম্বন্ধে তাছাড়া কি এর আর কোনো ব্যাখ্যা নেই?"

বন্ধু একটু ভেবে সূক্ষ্ম হাসি হেসে কৃপার সুরে বললে, "মোটেই না, তুমি নিতান্ত বর্বরের মত ব্যবহার করেছ।" তারপর এনসাইক্লোপিডিয়ার মত একখানা বই খুলে নিঃশব্দে আঙুল দিয়ে নির্দেশ করলে। দেখলাম লেখা আছে, 'When a gentleman is walking with a lady, the lady should be inside the man'।

পড়ে আমার মাথা চুলকানি বাড়ল তো কমল না। ইংরেজ ললনাকে খাদ্যবস্তুর সঙ্গে মিলিয়ে শাস্ত্রবাক্যের অর্থ বার করতে চেষ্টা করছি—এরাও অবশ্য ঐ রকম তুলনা করে থাকে, যথা লোভনীয় সুন্দরীকে লক্ষ করে অনেকে বলে What a dish !—কিন্তু তাতে সবটা ঠিক পরিষ্কার হচ্ছে না এমন সময় বন্ধু ব্যাখ্যা করলে, "মেয়েরা হাঁটবে ফুটপাথের ভিতরের দিকে আর পুরুষরা রাস্তার দিকে, আজ বেড়াবার সময় সে জ্ঞান ছিল কি তোমার ?"

মুখের কথা

কুশল প্রশ্ন করতে আমরা বলি 'কেমন আছেন' বা আরো অন্তরঙ্গ সুরে 'কেমন চলছে'। জার্মান, ফরাসী বা ইটালীয়দেরও ঐ একই প্রশ্ন। ইংরেজ প্রথম পরিচয়ে বলবে How do you do, সেটা অনেকটা ঐ কুশল প্রশ্নের মতই শোনায়, কিন্তু প্রত্যুত্তরে বিদেশী যদি বলে ভাল আছি তবে সে হেসেই খুন হবে। ঐ সম্ভাষণের উত্তরে যে একই সুর গাইতে হবে, অর্থাৎ 'কেমন আছেন' প্রশ্নের উত্তরে যে 'কেমন আছেন' বলাই একমাত্র স্বাভাবিক ও যথার্থ প্রত্যুত্তর এই সহজ কথাটা যারা জানে না তারা ইংরেজের চোখে একেবারে বাঙাল।

পক্ষান্তরে ইংরেজ যখন কাউকে পরিচয় করিয়ে দিতে ফরাসী ভাষায় বলবে আপনাকে মিস্টার স্মিথের সঙ্গে introduce করতে চাই, তখন ফরাসীর হাসি চাপা দায় হবে; তার কাছে ওর মানে দাঁড়াল, আপনাকে মিস্টার স্মিথের মধ্যে ভরতে চাই।

প্রথম পরিচয়েই ভাষার বাধা যদি হয় এমন দুরূহ তবে পরবর্তী আলাপে সমস্যা আরো কঠিন। বাংলা বা হিন্দী শিখতে গেলে বিদেশীরা 'আমার আছে' কথাটা সহজে হজম করতে পারে না কারণ অধিকাংশ ভাষাতেই ওখানে সম্বন্ধ পদের বদলে 'আমি' শব্দ দিয়ে বাক্যটি রচিত হবে। 'এটা কি?' এই সরল প্রশ্ন ফরাসী ভাষায় হয়ে দাঁড়ায় 'এটা যা তা কি?' আবার বাংলা এবং ফরাসী (অথবা ইটালীয়) ভাষার মধ্যে কিছুটা ঐক্য পাওয়া যায় উপরোক্ত ঐ 'কেমন চলছে' 'ভাল চলছে' এই প্রশ্নোত্তরের মধ্যে; ফরাসীরা আবার কখনো বলবে 'বেশ গড়িয়ে চলেছে'।

এসব হল ইডিয়ম বা ভাষার চাল, ঠিক যেমন ব্যবহারের চালচলন

বাঁধা আছে দেশে দেশে। এতে নিশ্চয় সব জাতির সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য বাড়ে কিন্তু কোনো দেশেই স্কুলের ছেলেমেয়েরা তার থেকে খুব মনের জোর পায় না। এক তো আছে বানান ব্যাকরণের নিয়ম, ব্যতিক্রম ও আর্যপ্রয়োগে সব ভাষাতেই যা কণ্টকিত, সেটা শেষ হতে না হতে আসে ইডিয়ম। একটা শিখতে যা চোখের জল ঝরে তা দিয়ে যদি হয় প্রশান্ত মহাসাগর তো আরেকটার থেকে অতলান্তিক। অথচ সব ভাষাতেই এ সমস্ত নিয়ম নিতান্ত কৃত্রিম খেয়ালে গড়ে উঠেছে।

ভাষার বিবিধ সাজসজ্জা ও অলংকারও এক এক সময় অর্থকে ঘোলাটে করে তোলে। ইংরেজের বাক্যালাপে যেমন কথার মাত্রা ‘আমি ভয় পাচ্ছি’। ‘আমি ভয় পাচ্ছি যে আমি তোমার নাম জানি না’, ‘আমি ভয় পাচ্ছি যে আমি যেতে পারব না’। যদি বক্তব্য হয় ‘আমি যাব’ হয়তো আসলে সে বলবে ‘কেন যে যাব না তা বুঝতে পারছি না’। তর্ক-যুদ্ধে মতদ্বৈধ হলে আমরা যদি বলি ‘আমি তা মানি না’, অন্য কেউ যদি বলে ‘আমার মনে হয় এই রকম’, ইংরেজী শিষ্টতার সুর হল ‘আমি জানি না, কিন্তু…’। সেখানে যে শ্রোতা ভাববে জানি না বলে ইংরেজ তর্কে হেরে গেল তার মত মূর্খ আর নেই—ইংরেজ শুধু বলছে তুমি জান না।

অবশ্য মুখের কথা আর মনের কথার এই ব্যবধান পাশ্চাত্যের সর্বত্রই বিদ্যমান, তবে হয়তো ইংলণ্ডে সবচেয়ে বেশী ও আমেরিকায় সবচেয়ে কম। একটু ভাবলেই আরো অনেক দৃষ্টান্ত বার করা যায়। আমাদের মত যারা শিষ্টতার এই আদর্শে অভ্যস্ত নয় তাদের পক্ষে এক এক সময় বেশ সমস্যার সৃষ্টি হয়। আপিশের কর্তা যদি বলেন অমুক লোক খুব ভাল কর্মী, অথবা সুন্দরী তরুণী যদি বলে অমুকে ‘চমৎকার লোক’ তবে প্রোমোশনের বা বিবাহের প্রস্তাব করে বসলে

বোকা বনতে হতে পারে। একবার এক ইংরেজ বন্ধুকে এই সমস্যার কথা জানিয়ে বলেছিলাম, "তোমাদের মনের কথা বুঝতে এক এক সময় অলৌকিক শক্তির দরকার করে।"

শুনে সে খুব অবাক হল, তার ধারণা তাদের মুখ আর মন এক।

উদাহরণ দিয়ে বললাম, "ধর তুমি আমার একটা গান শুনে বললে, বা বেশ। তোমার সঙ্গে খুব বেশী বন্ধুত্ব না থাকলে তখনি আমার মনে প্রশ্ন হবে তুমি সত্যিই ভাল বলছ না খারাপ বলছ।"

সে বললে, "কেন good ছাড়া কি আমাদের কথা নেই? Very good, very good indeed তো রয়েছে।"

অর্থাৎ ঐ তিনটি বিশেষণের অর্থ: ভাল = খারাপ, খুব ভাল = মাঝারি, খুবই ভাল = ভাল। অবশ্য ব্যাখ্যা এত সহজ নয় সব ক্ষেত্রে, তা যদি হত তো গাণিতিক ফর্মুলাতে ফেলে সব কিছুর মানে করা যেত। সমাজের স্তর, পরিচয়ের গভীরতা, ব্যক্তিগত চরিত্র ইত্যাদি অবস্থা ভেদে একই কথার অর্থ ভেদ। বাইরের লোক এই ফাইন আর্ট ক্রমশ আয়ত্ত করে বহুদিনের বসবাসে, তখন সে'ও মনের কথা ঢাকতে শেখে এদের মত।

ইংরেজরা পৃথিবীর অন্য ভাষার লোককে জব্দ করার আরো একটা বুদ্ধি বার করেছে উচ্চারণের মারপ্যাঁচে। জায়গার বা রাস্তার নামে প্রায়ই বানানকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে নিজেদের খুশিমত একটা কিছু উচ্চারণ বানিয়ে গোঁড়া ধার্মিকের মত তারা তা আঁকড়ে বসে থাকে। লণ্ডনের নতুন আগন্তুক যদি দিব্যদৃষ্টির অভাবে পরিষ্কার দেখতে না পায় হোলবোর্নকে কেন হোবর্ন বলাই উচিত, অথবা লেইসেস্টার স্কোয়ারকে লেস্টার স্কোয়ার, তবে তার গেঁয়োমি দেখে কৃপা ও আত্মপ্রসাদে ইংরেজের বুক ফুলে ওঠে। এমনি আরো কত আর্যপ্রয়োগ ছড়ানো ওদের পথে ঘাটে, বাইরের লোক তাতে হোঁচট

খেয়ে মরে আর ইংরেজ হেসে খুন হয়। শব্দের বহুবচন তৈরিতেও এই ধরণের মৌলিক প্রতিভা প্রয়োগ করে ইংরেজ আবার দেখিয়েছে যে তার মুখের বচন বাজারের আর দশটা খেলো ভাষার সঙ্গে মোটেই তুলনীয় নয়; ইংরেজীতে বহুবচনে শব্দের শেষে সব রকম কল্পনীয় পরিবর্তন তো পাওয়া যাবেই, উপরন্তু এমন অনেক কথাও আছে যার কোনো পরিবর্তনই নেই। এর যুক্তিসঙ্গত হেতু দেখানোর কথা অবশ্য তাদের মনেই হয় না, কারণ কে না দেখতে পাচ্ছে cannon বা sheep শব্দের পিছনে s যোগ করলে তা কেমন হাস্যকর হয়ে দাঁড়ায়।

ভাষা সম্বন্ধে ইংরেজের বিশেষ গর্ব আছে। তার চোখে দুনিয়াটা দুভাগে বিভক্ত—ইংরেজ আর অ-ইংরেজ। একটা দেশী, আরেকটা বিদেশী। এই সহজ ব্যবস্থাটা জগতের অন্য কোনো কোনো লোকে মানতে চায় না বলে, অর্থাৎ নিজেদের বিদেশী বলে চিনতে পারে না বলেই দেশে দেশে আজ ভাষার এমন দুরূহ প্রাচীর। তাই ইংরেজ স্বভাবতই খুব বিরক্ত হয় যখন দেশের বাইরে গিয়ে দেখে ফরাসীরা বা গ্রীকরা তার কথা বুঝতে পারছে না, বিদেশী ভাষা আঁকড়ে বসে আছে।

সংস্কারব্রতী ভাষাজ্ঞানীরা বিশ্বভাষা সৃষ্টি করতে চেষ্টা করেছেন কিন্তু তা সাধারণ লোকে ভাল চোখে দেখে নি। বানান ও ব্যাকরণের জটিল নিয়ম ও নির্বোধ ব্যতিক্রম বাদ দিয়ে স্কুলের ছাত্রদের স্বপ্ন সফল করা সম্ভব। এতে আন্তর্জাতিক বিরোধ ও বৈষম্যও কমতে পারে। কিন্তু বহুমূল্য 'জাতীয় বৈশিষ্ট্য' বা 'সংস্কৃতি'তে ঘা পড়বে। তাছাড়া সমস্যা ওতেও সম্পূর্ণ মিটবে না। এস্‌পারান্টো ভাষাতেও 'মন্দ' বোঝাতে ইংরেজ বলবে 'ভাল'। মুখের কথা আর মনের কথার তারতম্য বিশ্বভাষাতেও থাকবে।

অবশ্য এই গরমিল অল্পবিস্তর সব দেশেই আছে, নয়তো বোধহয় একদিনের মধ্যেই সমাজ অচল হয়ে পড়বে। আপিশের বড়বাবুকে 'সার আপনি আমার বাপ মা' না বলে যদি বলি 'আপনার ধ্বংসের জন্য আমার নিরন্তর প্রার্থনা' তাহলে জীবিকা অর্জন কিঞ্চিৎ কঠিন হয়ে পড়তে পারে। শাশুড়ী ঠাকুরানী যখন 'নিতান্ত অনুরোধের দায়ে' আরো কিছুদিন থেকে যেতে রাজী হন তখন তাকেও ঐ কথা জানাতে পারলে প্রাণটা অনেকখানি হালকা হয়ে যেত কিন্তু গার্হস্থ্য শান্তি বাড়ত না।

এই যে আমরা বিদায় নেবার সময় বলি 'আচ্ছা আসি' তাও তো মনের ভাষা নয়, কারণ ওটা হল আবার দেখা হবে এ কথা সূক্ষ্ম করে জানানো। যেখানে জানি আর দেখা হবে না সেখানেও বলি ও কথা। শুনতে ভাল কারণ এর মধ্যে চিরকালের সমাপ্তি নেই। সেজন্যই দেশে দেশে বিদায়ের সুর 'আবার দেখা হবে'—ফরাসীদের ওর্‌ভোআ, ইটালীয়দের আরিভেডের্চি, জার্মানদের আউফ ভিডেরসেহেন। ক্যানাডার থেকে বিদায়ের সময় সবারই মুখে ছিল See you again, যদিও সবাই জানত সে আশা নিতান্তই ক্ষীণ। এস্থলে ইংরেজের গুডবাই শুনলেই মন যেন কেমন দমে যায়।

অতলান্তিকের দুই পারে ইংরেজী ভাষার তারতম্য অবশ্য এর চেয়ে আরো গভীর। উচ্চারণের ও বানানের পার্থক্যের কথা আমরা অল্পবিস্তর জানি। ইংরেজরা জেদ করে টোমাটো এবং পোটেটো বলবেই দেখে আমেরিকানদের বিদ্রূপের শেষ নেই; দুইয়েরই এক ধরণের বানান, দুইই তরকারি—হয়তো এক টেবিলেই রয়েছে—সুতরাং তাদের মতে বিলেতী বেগুনকে নিশ্চয় হতে হবে টোমেটো। অবশ্য এই যুক্তির পরিণতি স্বরূপ but আর put শব্দের সনাতন আকৃতি দূর করা নিয়েও ওরা গভীর ভাবে মাথা ঘামাচ্ছে। সমাধান

এতদিনে নিশ্চয় হয়ে যেত কিন্তু সমস্যা এই যে butকে বুট করবে না putকে পাট করবে। ডেমক্র্যাটিক পার্টি প্রথমটার পক্ষে কিন্তু রিপাবলিকানদের দৃঢ় বিশ্বাস যে কমিউনিস্টরা ঠিক তাই চায়, বর্তমানে তাই দু পক্ষই তাকিয়ে আছে সেনেটার ম্যাকার্থির মুখের দিকে।

শব্দ ও ইডিয়মের দিক থেকেও এই অগ্রগামী নতুন জাতি প্রায় এক নতুন ভাষা গড়ে তুলছে আজ। ঐ টোমেটো শব্দেরই যেমন ও দেশে দুটো অর্থ। রেস্তরাঁতে খেতে খেতে আমেরিকান যদি মন্তব্য করে "What a tomato!" তবে তার দৃষ্টি অনুসরণ করে গেলে থালার সবজিতে না পৌঁছে বর্ণে রসে উজ্জ্বলতর পরিবেশিকার প্রতি নিবদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। চকোলেট, ফুটপাথ, সিনেমা ইত্যাদির পরিবর্তে যথাক্রমে candy, sidewalk, movie ইত্যাদি তৈরি হয়েছে আমেরিকান প্রতিশব্দ।

আসলে ইংরেজী কার ভাষা তা নিয়েই প্রায় মতভেদ। কথিত আছে, আমেরিকার পল্লী-অন্তরে একবার এক ইংরেজ ক্রেতার সঙ্গে আলাপ করে দোকানদার খুব অবাক হয়ে গেল। জিজ্ঞাসা করলে, "তোমার সুর শুনে বুঝতে পারছি তুমি আমেরিকান (আমাড়িগান!) নও, অথচ এমন ইংরেজী শিখলে কি করে?"

ইংরেজ আরো অবাক হয়ে বললে, "আমার বাড়ি যে ইংলণ্ডে।"

আবার প্রশ্ন হল, "সে দেশে কি ইংরেজী বলে নাকি?"

এমন অপোগণ্ড আজ অবশ্য খুব কমই আছে; এখন অধিকাংশ আমেরিকানই জানে ইংলণ্ডের লোক ইংরেজী বলে। তবে ভাষাটা তারা নিয়েছে আমেরিকার থেকে (যদিও তার প্রায় জাত মেরে দিয়েছে বানানে ও উচ্চারণে) এবং ভাষার থেকেই দেশের নামকরণ করেছে; স্প্যানিশ থেকে যেমন স্পেইন, তেমনি ইংলিশ থেকে ইংলণ্ড।

ইংলণ্ডের ইংরেজীও অবশ্য সর্বত্র এক নয়; কোনো দেশের ভাষাই তা নয়, যদিও আমাদের বাংলার মত শুদ্ধ চলিতের যুগ্ম ধারা কম দেশেই আছে। ইংলণ্ডে ইংরেজীর মানদণ্ড আজকাল হয়ে দাঁড়িয়েছে ওদের বেতার বি-বি-সি। ভাষার প্রামাণিক গঠনে ও সংস্কৃতিতে বেতার যে কতখানি সাহায্য করতে পারে তা আর কাউকে বলে বোঝাতে হবে না। তাই কলকাতা রেডিও যখন নিজের পরিচয়ে এক-বার বলে 'অলইণ্ডিয়া রেডিও' (অল ইণ্ডিয়া নয়), আবার এক মিনিট পরেই 'আকাশবাণী', দিল্লীর থেকে বাংলা খবরে একই বক্তা যখন কখনো বলেন 'হাইড্রোজেন বোমা' কখনো বলেন 'উদযান বোমা' তখন এই বৈষম্যের হেতু খুঁজে পাওয়া যায় না। ঐ ইংরেজী শব্দগুলিকে যদি টেবিল চেয়ারের মত বাংলায় আনতে হয় তবে তারা নিঃসংকোচে আসুক; আর এই দ্বিধা যদি হয় বিলেতী বয়কটের পূর্বাভাস তবে ঐ দেশী শব্দগুলি কুণ্ঠিত উঁকিঝুঁকি না মেরে সামনে এসে জায়গা দখল করুক।

ইংরেজীর নির্বাসনই শুনি আমাদের সরকারী নীতি। বর্তমান যুগে দেখতে দেখতে পৃথিবী আজ অনেকখানি সংকুচিত হয়ে পড়েছে, চলা-ফেরার সুবিধার থেকে কৃষ্টির আদান প্রদান বাড়ছে দেশ দেশান্তরে। ভাষার বৈষম্য যে এক্ষেত্রে কত বড় বাধা সেটা আজ যেমন বোঝা যাচ্ছে এমন আর কখনো যায় নি। জগতের সবচেয়ে চলতি ভাষা ইংরেজী, সেটা ছিল বংশ পরম্পরায় আমাদের আয়ত্তে। ভারতের নতুন রাজনৈতিক-আন্তর্জাতিক অগ্রগতির সঙ্গে ওটা কাজে লাগত আরো বেশী। তাছাড়া কৃষ্টি ও জ্ঞানের আমদানি রপ্তানি তো সহজ হতই। জাপানে আজ বিজ্ঞানের বড় বড় কাজ হচ্ছে, কিন্তু বিশ্ববিজ্ঞানের সভায় অনেক সময় তার খবর গিয়ে পৌঁছায় না। অনেক পত্রিকা সেজন্য ওরা একসঙ্গে ছাপে জাপানী ও ইংরেজী ভাষায়। রুশ

বিজ্ঞানের তথ্য সংগ্রহ করাও অপেক্ষাকৃত দুরূহ। ভারতের এক মস্ত সুযোগ ছিল বিশ্বপ্রগতি ও আন্তর্জাতিক সংস্কৃতির খাতিরে জগতকে এক নতুন উদার দৃষ্টান্ত দেখানো।

আমরা রাজনীতিতে এগোতে চাই, অথচ সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নিজেদের করে ফেলছি একঘরে। 'স্বদেশী' আত্মগর্বে এখন পাচ্ছি এর ক্ষতিপূরণ, যদিও আমাদের বংশধররা এর জন্য কৃতজ্ঞতায় গদগদ নাও হতে পারে। কিন্তু ততদিনে ইংরেজী শেখার কাঠামোটা মরচে পড়ে হয়তো নষ্ট হয়ে যাবে।

পরের মুখের ঝাল

এটা হল গলাবাজির যুগ—এবং ফলে প্রায় অপরের কথায় চলার যুগ। বক্তৃতা, বেতার, সংবাদপত্রের মারফত আধুনিক সমাজ যেন কথার সমুদ্রে হাবুডুবু খাচ্ছে। সবাই বলতে চায়, কেউ কান পাততে রাজী নয়। রাজনৈতিক নেতাদের ঘন ঘন ভাষণ, হাজার রকম সভা-সমিতির অধিবেশন ইত্যাদি অর্থহীন কথা অথবা সর্বজনবিদিত পুনরুক্তিতে এত ভারাক্রান্ত যে ছাঁকলে শতকরা এক ভাগও সারপদার্থ বার করা যায় না।

কথার বাহন হয়ে বেতার ও সংবাদপত্র আধুনিক সমাজের এই দুর্গ্রহ ক্রমশ বাড়িয়ে চলেছে, এবং তার সঙ্গে আবার আছে বাহনের নিজস্ব অবদান—বিজ্ঞাপন। সম্প্রতি টেলিভিশন বা টিভি লোককে চোখে আঙুল দিয়ে শোনাতে আরম্ভ করেছে নিজের বক্তব্য। টিভি-র আক্রমণে রঙ্গজগতে চলচ্চিত্রের একচ্ছত্র আধিপত্য আজ বিপন্ন। সিনেরামা, প্যানোরামা, সিনেমাস্কোপ প্রমুখ প্রকাণ্ড পর্দার সাহায্যে কিংবা 3-D বা তিনায়তন ছবি দিয়েও প্রতিযোগিতায় চলচ্চিত্র খুব সুবিধা করতে পারছে না। প্রাণপণ চেষ্টা চলেছে 'চশমাহীন' তিনায়তন ছবির দিকে, কিন্তু তার একটি মাত্র কার্যকরী পদ্ধতি যা জানা আছে তা এক রুশদেশে ছাড়া কোথাও সাধারণ ভাবে দেখানো হয় না।

টিভি গার্হস্থ্য জীবনে এনেছে বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে বড় বিপ্লব। ছেলেমেয়েদের পড়াশুনো চুলোয় যাচ্ছে, গৃহিণীর রান্নায় পোড়া লাগছে, কর্তাকে খাবার টেবিলে আনা বেবিকে খাওয়ানোর চেয়েও কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। অবশ্য টিভি ও রেডিওর একটা মস্ত সুবিধে

এই যে বেশী বিরক্ত করলে কান মলে মুহূর্তে তাদের বাক্‌রোধ করা যায়। যদিও কোনো কোনো ঘরে বাচাল ছেলেমেয়েদের উপরেও ঐ ওষুধ চলে, অনেক গৃহেই অনর্গল কথার অত্যাচার আরেকটা আছে যার সামনে গৃহস্থ নিতান্তই অসহায়।

আমেরিকাতেই অবশ্য টিভি ও রেডিও সবচেয়ে বেশী উন্নত ও প্রসারিত; শিগগিরই রঙিন টিভি আরম্ভ করবে ওরা। যারা ভাবেন ও দেশের টিভি ও রেডিও খালি বিজ্ঞাপনেই ঠাসা তারা নেহাতই অজ্ঞ। আসলে বিজ্ঞাপনের মাঝে মাঝে সময়ের ফাঁক ভরাবার জন্য গান বাজনা কমিক ইত্যাদিও থাকে, ধৈর্য ধরে কান পেতে থাকলে কখনো কখনো তা শুনতে পাওয়া যায়। যথা, বিবিধ হলিউড-অভিনেত্রীর এই প্রাণখোলা স্বীকৃতি দশ মিনিট ধরে যে শুনবে যে লাক্স সাবান ব্যবহার না করলে তারা কোনোদিনই 'তারকা' হতে পারতেন না, সে হয়তো তাদেরই একজনের অভিনীত এক নাটক শুনতে পাবে দু মিনিটের জন্য। কোকা কোলা পান না করা যে কতদূর সেকেলে তার ব্যাখ্যান শুনতে শুনতে শ্রোতা যদি ঘুমিয়ে না পড়ে তবে পুরস্কার স্বরূপ সে পাবে এড্‌গার বার্গেন ও চার্লি ম্যাকার্থির রঙ্গ-নক্‌শা যতক্ষণ বিজ্ঞাপন-বক্তার লাগে দম নিয়ে গলা পরিষ্কার করতে।

তাছাড়া আছে শ্রোতাদের নিয়ে নানাবিধ প্রতিযোগিতা। অনুষ্ঠান-কর্তা হয়তো এক গানের সুর বাজালেন এক লাইন, তারপর টেলিফোনের বই খুলে প্রথমে যার নাম চোখে পড়ল তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন গানের নাম। যদি সে বলতে পারে তবে পাবে পাঁচ ডলার, নয়তো 'সান্ত্বনা পুরস্কার' হিসেবে এক বাক্স বাসন-ধোয়া সাবান। অবশ্য সাবানের গুণকীর্তন শুনে মনে হয় যেন যে হেরেছে আসলে জিতেছে সেই। এ সাবান থালা ডেকচির গায়ে প্রায় ছোঁয়াতেই হয় না, ঘষাঘষি তো দূরের কথা। কিন্তু বাসন পরিষ্কার

করাই তার প্রধান কাজ নয়, তার চেয়েও বড় কথা হল যে এতে হাতের ত্বক অতি কোমল, মসৃণ ও ঝকঝকে হয়ে ওঠে; তার ফলে ঘরে ঘরে গৃহিণীরা চাকরানীর প্রতি হিংসায় মরে গিয়ে তাদের বহুমূল্য হাজার রকম ক্রীম নরদমায় বিসর্জন দিচ্ছেন। এটা অবশ্য সম্ভব হয়েছে এক অলৌকিক গুপ্ত উপাদানের ফলে (সাংকেতিক নাম 7-X), বহুদিনের বৈজ্ঞানিক গবেষণার পরে।

এই মসৃণ বক্তারা কেবলই যে বিরক্তি, অধৈর্য বা আমোদ উদ্রেক করে থাকেন তা নয়; এক এক জনের আশ্চর্য ক্ষমতা আছে শ্রোতাকে রীতিমত মুগ্ধ বা মুহ্যমান করে ফেলার, সম্পূর্ণ হাতের মুঠোর মধ্যে নিয়ে আসার। মনে আছে একদা শুনছিলাম এক মাথার তেলের বিজ্ঞাপন। বক্তা প্রথমে যখন জানালে যে এতে টাক মাথায় চুল গজায় হৈহৈ করে তখন আপন মনে তাচ্ছিল্য ও অবিশ্বাসের হাসিই হেসেছিলাম, কিন্তু সে হাসি নিভে যেতে দেরি হল না। এই লোকটি যে অন্যদের মত বাজে কথা বলে না, সে যে কেবল বিশ্বের টাকীদের দুঃখ ঘোচাবার জন্যই এ বার্তা বয়ে এনেছে বেতারে, তা অবিলম্বে বোঝা গেল কারণ নিছক গলাবাজির পরিবর্তে তার বক্তব্যে ছিল সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক যুক্তি। যুক্তিটা এই যে ঐ তেলে এমন এক উপকরণ আছে যা ভেড়ার লোমের গোড়া থেকে অনেক কষ্টে অনেক যত্নে নিষ্কাশিত করা হয়েছে (সেজন্যই বাজারের বাজে তেলের তুলনায় দাম একটু বেশী); এবং জগতে আর এমন কি জীব আছে যার কেশ মেষের মত ঘন ও দ্রুত গজায়? এর পরে অবশ্য বুদ্ধিমান লোকের আর সন্দেহ থাকতে পারে না যে মরুভূমির মত শুষ্ক, মার্বেলের মত মসৃণ টাকেও এই তেলের ছোঁয়া লাগলে চুল গজাতে বাধ্য। কিন্তু সাধারণ লোক এতই নির্বোধ যে এই সহজ কথাটা বৈজ্ঞানিক যুক্তি দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করতে বক্তার প্রায় আধ ঘণ্টা

সময় লাগল ; এবং অবশেষে যখন সে হাঁপাতে হাঁপাতে থেমে গেল তখন ঐ নির্বোধ সাধারণের একজন বলে লজ্জায়, এবং ঐ তেল আমার এখনো কাজে লাগবে না এই দুঃখে, টাকহীন মাথাটা আমার প্রায় এক সেকেণ্ড হেঁট হয়ে রইল।

গলাবাজির যুদ্ধে ও দেশে খবর-কাগজও পিছনে পড়ে নেই। তার কলেবর বৃহৎ, তিন চার আনা দিয়ে যে কাগজখানা মেলে তা এখানে পুরনো-কাগজওলার কাছে প্রায় এক টাকায় বিক্রি হবে ; কোনো উৎসাহী ব্যবসায়ী বুকপোস্ট ডাকে ওখান থেকে কাগজ আমদানির ব্যবস্থা করতে পারেন। কিন্তু এত বড় পত্রিকাতেও প্রায়ই খবর খুঁজে বার করা কঠিন কাজ ; বিজ্ঞাপন, খেলার গল্প, বাজার দর ইত্যাদির আশেপাশে ফাঁক ভরাবার জন্য তার ব্যবহার, রেডিওতে গান বাজনার মতই। কিন্তু এতে কারো অভিযোগ নেই, কারণ ঐ তিনটে বিষয়ে যথাক্রমে গৃহিণী, সন্তান ও কর্তার কৌতূহল মিটে যায়। তাছাড়া থাকে পাতার পর পাতা কমিক যার জন্য সমস্ত পরিবার উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করে। আমেরিকার সংবাদপত্র যথার্থই পরিবারের সকলের জন্য তৈরি।

এই কমিক জিনিসটি ওদের নিজস্ব সৃষ্টি হলেও আজ এ দেশেও তা ঢুকে পড়েছে, সুতরাং তার আর বিশেষ পরিচয়ের দরকার নেই। ও দেশে কমিক ছাড়া পত্রিকা বিক্রি প্রায় অসম্ভব। কেন যে এর নাম comics বা funnies হল তার গূঢ় রহস্য আমেরিকার বাইরে আজ পর্যন্ত কেউ ধরতে পারে নি—হপ্যালং ক্যাসিডি বা ডিক ট্রেসির রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতায় বীররসেরই প্রাধান্য, হাস্যরসের নয়।

আমেরিকানদের কর্মচঞ্চল জীবনযাত্রায় এসব পড়ে খবর পড়ার সময়ও থাকে না। ওদের দিন দিন নব নব আবিষ্কার—তাই আমার মনে হয় শিগগিরই খবরহীন খবর-কাগজের উদ্ভাবনা করে

ওরা আবার বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দেবে। আর কেনই বা তা হবে *না। সকলেই জানে আমেরিকানদের মত স্বাধীন জাত জগতে আর দুটো নেই, সব রকম বাধকতার ওরা পরিপন্থী, খবরের অত্যাচারই বা* চিরদিন সহ্য করবে কেন। রোজ সকালে উঠে সবাইকে খবর পড়তেই হবে, তা ভালই হক আর খারাপই হক, এই জুলুমের থেকে মুক্তি প্রয়োজন। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট 'চার স্বাধীনতা'র দাবি করার পরে ইতিমধ্যে অবশ্য ও দেশে আরো অনেক স্বাধীনতা তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, এটাই বা কেন হবে না।

আগেই বলেছি আমেরিকায় সবাই ব্যস্ত। খাওয়ার জন্য অনেকের বসার পর্যন্ত সময় নেই, তারা যাতে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে লাঞ্চ সেরে দৌড়ে কাজে যেতে পারে এমন দোকানও আছে সে দেশে। বলা বাহুল্য দিনের আরম্ভে এদের সময় খুবই কম, সেজন্য কোনো কোনো সংবাদপত্র এখন আগের দিন রাতে প্রকাশিত হয়। বিছানায় শুয়ে পরদিন কি ঘটবে জেনে কর্মবীররা নিশ্চিন্তে নিদ্রা দেন। কি আশ্চর্য উদ্ভাবনার ফলে আমেরিকার সম্পাদকরা পরবর্তী কয়েক ঘণ্টার ঘটনা দিব্যচক্ষে দেখতে পান তা বিদেশী সাংবাদিকরা এখনো জানতে পারে নি। তবে সবাই জানে আমেরিকাই আজ সারা বিশ্বে খবর সৃষ্টি করছে—হয়তো সেই কারণে রান্নাঘরের কাছে থাকার সুবিধেটা ওদের সম্পাদকরা পায়। অবশ্য খবরহীন খবর-কাগজ বেরোলে কারোই আর কোনো অসুবিধে থাকবে না, কোনো মানুষ বা দেবতার খেয়ালের দাস হয়ে থাকতে হবে না, ইচ্ছে করলে তিন দিন আগেও কাগজ বার করা চলবে।

সংবাদপত্র, রেডিও, ফিল্ম ইত্যাদির দৌলতে দেশে দেশে বিজ্ঞানের আজ প্রচণ্ড ক্ষমতা। সাম্প্রতিক এক উদাহরণ ধরা যাক—ক্লোরোফিল। 'আশ্চর্য বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার' 'প্রকৃতির নিজস্ব স্বাস্থ্য-

রহস্য' ইত্যাদি আখ্যা সহকারে ক্লোরোফিল আজ দেশে দেশে প্রচারিত হচ্ছে। এ দেশে এ যাবৎ এই 'সবুজ বিস্ময়' আমরা পেয়েছি *শুধু দাঁতের মাজনে, কিন্তু আমেরিকায় তা চিউয়িং গাম, নানা রকম* ক্রীম, সিগারেট, ছাইদান ইত্যাদি আরো প্রায় দেড়শো জিনিসে প্রবেশ করেছে। এসব পণ্যের প্রচারে ও বিজ্ঞাপনে ১৯৫১ সালে খরচ করা হয়েছিল আশি লক্ষ ডলার, ৫২ সালে দু কোটি ডলার; ফলে বিক্রির পরিমাণ যথাক্রমে সাড়ে তিন কোটি ও দশ কোটি ডলার। দাবি করা হয় যে ক্লোরোফিল জীবাণু নাশ করে, দেহের গন্ধ দূর করে ও নিশ্বাস পরিষ্কার করে। আসলে দাঁতের মাজন ও অন্যান্য যাবতীয় জিনিসে যে পরিমাণে তা থাকে তাতে তার কোনো গুণই প্রায় ধরা পড়ে না; অন্তত বিজ্ঞান তা ধরতে পারে নি। দ্বিতীয়ত, বিজ্ঞাপনে এই প্রসঙ্গে 'প্রকৃতি'কে যেভাবে ফলানো হয় তার কোনো ভিত্তি নেই। কলকাতায়ই এই শ্রেণীর এক ছোট ফিল্মে দেখেছিলাম যে জিরাফ, হাতি ও অন্যান্য বনের পশুরা এক দুষ্টু ছেলেকে দাঁতের স্বাস্থ্য ও মুখের গন্ধ দূর করার রহস্যে দীক্ষিত করছে। এত লক্ষ লক্ষ বছর ধরে তারা যে গাছের পাতা খেয়ে আসছে তা শুধু ক্লোরোফিলেরই জন্য, যদিও নির্বোধ মানব সবে জানতে পেরেছে তার গুণ। এই ধরণের ছবি দেখে বা বিজ্ঞাপন পড়ে এই প্রশ্নটা মনে থেকে যায় যে সের কয়েক ঘাসপাতা খাইয়েও গরু ছাগলের মুখের সুগন্ধে তাদের গলা জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছা করে না কেন। এ সমস্ত 'বৈজ্ঞানিক' বিজ্ঞাপন অবশ্য এ কথাটাও কখনো জানায় না যে ক্লোরোফিল গাছের পাতায় যে অবস্থায় থাকে রাসায়নিক উপায়ে তার কিছুটা কৃত্রিম পরিবর্তন না করলে তার কোনো গুণই খোলে না। মানুষ ছাড়া আর কোনো জন্তু ঐ ধরণের ল্যাবরেটরি এখনো বানিয়েছে বলে জানা যায় নি।

পরিশেষে কাব্যের রসে এই প্রসঙ্গ সমাপ্ত করতে চাই। সিনেমার মাধ্যমিক বিরতির সময় গাওয়া এই গানটি আমেরিকায় আমার প্রায় মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। সেখানে অবশ্য কার্টুন ছবিতে দুটি ছেলেমেয়ে এটা গেয়েছে সুর করে, চক্ষু কর্ণের ঐ সংগত ছাড়া গানের ঐশ্বর্য প্রায় সবটাই মারা পড়ছে। তবু আমেরিকান বিজ্ঞাপনের ও ভাষা-বৈচিত্র্যের নিদর্শন স্বরূপ এর কিছুটা দাম থাকতে পারে।

Let's all go to the lobby and give ourselves a treat.

Delicious things to eat,
The pop-corn can't be beat,
The sparkling drinks are just dandy
And chocolate bars and candy—

Let's all go to the lobby and give ourselves a treat.

এক পয়সায় চারটে

পশ্চিম দেশের লোক প্রাচ্যের ছত্রিশ কোটি দেবতা, পুতুল পূজা এবং অন্যান্য সংস্কারের প্রতি লক্ষ করে আমাদের পরিহাসবাণে জর্জরিত করে এসেছে। তাদের ভাব দেখে মনে হয় সংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের অন্ধকূপে আমরাই একমাত্র মণ্ডুক। আসলে শ্বেতাঙ্গের মনও বিজ্ঞান ও যুক্তির আলোতে সর্বদা ঝলমল করে না। এ দেশে কুসংস্কার যদি মেলে পয়সায় চারটে, পাশ্চাত্যেও তা খুব দুর্লভ নয়। কিন্তু এখানে তো সব জিনিসই অপেক্ষাকৃত সস্তা, মানুষের জীবন পর্যন্ত।

আমাদের যেমন বাঁয়ে শেয়াল, ডাইনে মড়া বা সবৎসা গাভী দেখা ভাল ওদের তেমনি কালো বেড়াল আনে সৌভাগ্য। আমাদের টিকটিকি সত্যি কথায় সায় দেয়, মেঘ ডাকলে ওদের নাকি দুধ টকে যায়। পিছু ডাকলে বা হাঁচিতে আমাদের কাজে বাধা পড়ে, তেমনি মইয়ের নিচ দিয়ে যাওয়া ওদের নিষিদ্ধ। এ দেশে জ্যেষ্ঠ পুত্রের মা জ্যৈষ্ঠ মাসে লাউ খেতে ভয় পায়, পাশ্চাত্যের আবাল বৃদ্ধ বনিতা সারা বছর তের সংখ্যাকে এড়িয়ে চলবে অমঙ্গলের আশঙ্কায়। হোটেলে ধারাপাতের ধারাকে উল্টে দিয়ে ১২র পরেই ১৪, কারণ ১৩ নম্বর ঘরে কেউ রাত কাটালে পরদিন তার মৃতদেহটাও হয়তো পাওয়া যাবে না। এক জায়গায় কখনো দু বার বাজ পড়ে না এ ধারণা হয়তো আমাদের ঠাকুমার মুখে মানাত, কিন্তু আসলে ওদের সাধারণ লোকে অনেকেই তা বিশ্বাস করে—যদিও পৃথিবীর উচ্চতম গৃহ এম্পায়ার স্টেট অট্টালিকা তৈরি হওয়ার দশ বছরের মধ্যে আটষট্টি বার বজ্রাঘাত হয়েছে তার মাথায়।

বিশ্বাসপ্রবণতা সাধারণ লোকের মধ্যে দেশে দেশে প্রায় সমান,

এবং এক এক সময় মনে হয় যেটা যত বেশী 'অবিশ্বাস্য' বা 'অলৌকিক' সেটা তত সহজে মানুষে গ্রহণ করে। বোধহয় এই বিরস একঘেয়ে জীবনে রোমাঞ্চকরের প্রতি আমাদের এক আকাঙ্ক্ষিত আশার টান আছে। এর বিরুদ্ধে বিজ্ঞান অনেক ক্ষেত্রেই অসহায়। সাপুড়ের বাঁশি শুনে সাপ বশ মানে এ সম্বন্ধে রাম ও জোন্স্ একমত, যদিও বিজ্ঞান বলতে আরম্ভ করেছে যে সাপ আসলে বাঁশি শুনতেই পায় না, সাপুড়ের তরঙ্গিত দেহভঙ্গি দেখে সে সম্মোহিত হয়ে পড়ে এবং তার অনুকরণে অঙ্গ চালনা করতে থাকে। স্পেইন দেশের ষাঁড়ে-মানুষে লড়াই দেখতে নানা দেশ থেকে কাতারে কাতারে লোক যায়, তাদের একজনও বোধহয় বিশ্বাস করবে না যে ঐ যে রক্তিম কাপড়টা চোখের সামনে নাচিয়ে ষাঁড়কে ক্ষেপিয়ে তোলা হয় তার রঙের কোনো তাৎপর্য নেই; ষাঁড় আসলে বর্ণান্ধ—কাপড়ের নড়াচড়া দেখেই সে বিরক্ত হয়, লাল রঙে নয়। সাদা বা নীল কাপড় নিয়ে এ খেলা কল্পনাই করা যায় না, এখানে লালের রোমাঞ্চ অনেক বেশী; ষাঁড় বা খেলোয়াড়ের রক্তের সঙ্গেও তা খাপ খায় চমৎকার। সুতরাং এক্ষেত্রে ষাঁড় মোটেই বর্ণান্ধ নয়, বরং ঐ শুকনো বৈজ্ঞানিকদেরই চশমা-ঢাকা চোখে রঙের তাৎপর্য ধরা পড়ে না।

বিশ্বাসপ্রবণতা থেকে সংস্কারের দূরত্ব খুব বেশী নয়। একটা পেকে হয় আরেকটা, তখন সমাজের মধ্যে অবশ্যমান্য অনুষ্ঠানের স্থান গ্রহণ করে। কি করে এই বিশ্বাসের বীজ গজায় দেশে দেশে তার অগণ্য দৃষ্টান্ত দেখা যায় এই আধুনিক যুগেও। এদের সবগুলির শুধু নাম করেই অভিধান-প্রমাণ গোটাকয়েক বই লেখা যেতে পারে। এখানে সামান্য কয়েকটির উল্লেখ করা ছাড়া উপায় নেই।

চিরোপবাসী বালিকা ধনলক্ষ্মী বা নেকড়ে-পালিত বালক রামু বিশ্বের প্রবাদ-কাহিনীতে ভারতের নিজস্ব নবতম দান। ধনলক্ষ্মীর

বুজরুকি ধরা পড়ে ভারতীয় আধ্যাত্মিক শক্তির মাহাত্ম্য জগতের চোখে অবশ্য একটু ক্ষুণ্ণ হল, কিন্তু বনের পশুকে ডেকে এনে জেরা করা সহজ নয়। আমাদের শিশুদের প্রতি নেকড়ে মাতার আকর্ষণ অবশ্য এর আগেও বারে বারে দেখা গেছে—মেদিনীপুরের বিখ্যাত কমলা ও তার জ্যেষ্ঠা সঙ্গিনীর গল্প এখনো অনেকের মনে থাকতে পারে। আমাদের অহিংস দেশে নেকড়ের এই ব্যবহারে অবশ্য আশ্চর্য হবার কিছু নেই, বিস্ময়ের বিষয় এই যে পাশ্চাত্যেও মাঝে মাঝে নেকড়ে, ভেড়া, বানর বা শুয়োরের স্তন্যে লালিত মানুষের আবির্ভাব হয়ে থাকে। এমন কি ১৯৪০ সালে হলাণ্ডের উপকূলে ভেসে এসেছিল এক মীন-মানবী বা মাছের ঘরে লালিত মানব কন্যা। আধুনিক যুগেও ওরা পিছনে পড়ে নেই। মাত্র ১৯৪০ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় এক বানর-লালিত নর আবিষ্কৃত হয়, আমেরিকার অনেক পণ্ডিত পত্রিকা ও প্রোফেসার তাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে। কিছু দিন পরে জানা গেল যে যে সময়টা তার গাছে গাছে কাটাবার কথা ছিল সেটা কেটেছে জেলে। কিন্তু বলা বাহুল্য ইতিমধ্যে অনেকেই পয়সা দিয়ে দেখে এসেছে এই 'অলৌকিক বিস্ময়'।

নেকড়ে-মানুষের গল্প অধিকাংশই এ দেশ থেকে বেরিয়েছে, কিন্তু বিদেশী সংবাদপত্র ও তথ্যবিৎ পণ্ডিতরা তাতে উৎসাহ ও বিশ্বাস দেখিয়েছেন অনেক সময় আমাদের চেয়ে বেশী। গাদা গাদা বই ও সারগর্ভ সন্দর্ভ লিখেছেন তারা নিজেদের বিশ্বাসের সমর্থনে। পাশ্চাত্য সভ্যতার পীঠস্থান রোম নগরীর সঙ্গেই বোধহয় নেকড়ে-বালকের পুরাতনতম গল্প সংশ্লিষ্ট; ওদের পুরাণে বলে ঐ নগরীর প্রতিষ্ঠা করেছিল রেমুস ও রোমুলুস নামক দুই নেকড়ে-বালক। সে যাই হক, দেশী বা বিলাতী কোনো নেকড়ে-পালিত শিশুর গল্পই এ পর্যন্ত সত্য বলে প্রমাণিত হয় নি; অনেক ক্ষেত্রেই

মিথ্যা ধরা পড়েছে, এবং বৈজ্ঞানিক যুক্তি যা আছে তা এর বিরুদ্ধে।

পাথর বৃষ্টি বা মাছ বৃষ্টির গল্পও প্রধানত ভারতেরই রপ্তানি বাহির বিশ্বে। প্রথমটি সাধারণত এক বাড়ির ছাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে (টিনের চাল হলেই ভাল), তা ভূতের কাজ বলেই ধরে নেওয়া হয় এবং গৃহস্থ যতদিন তার ঘর ছেড়ে না পালান ততদিন এই 'শিলাবৃষ্টি' বেড়েই চলে। বৃষ্টির সঙ্গে মাছ পড়ার গল্প বিদেশ থেকেও শোনা যায়, তবে কম পরিমাণে ; এবং সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে মানুষের বিশ্বাসপ্রবণতাও কি রকম বেড়েছে তা বোঝা যায় এই দেখে যে মাছের সঙ্গে ক্রমশ পাথর, কুড়োল, ব্যাং, শামুক, সাপ, এমন কি এক 'আস্ত বাছুর' পর্যন্ত নাকি বর্ষাতে দেখা গেছে। বলা বাহুল্য নানা দেশের পণ্ডিতরা এসবের ব্যাখ্যা নিয়ে অনেক তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ ও তত্ত্বকথা লিখেছেন, যদিও মাছ বৃষ্টি ঘটে কিনা তারই কোনো প্রমাণ নেই।

আমাদের যেমন আছে ভূতে ধরা ওদের তেমন আছে শয়তানের সঙ্গে যোগ বা witchcraft। দু দেশেই যে 'ধরা পড়ে' তার দুর্গ্রহের অন্ত থাকে না। শয়তানী ষড়যন্ত্রের অপরাধে মৃত্যুদণ্ড অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষেও আইনসঙ্গত ছিল, এবং আজো অনেকে এই ডাইনীতন্ত্রে বিশ্বাস করে ও সংবাদপত্রে এর গল্প ছাপা হয়।

১৭২৬ সালে এক ইংরেজ মেয়ে স্তম্ভিত বিশ্বের কাছে সগর্বে 'প্রমাণ' করেছিল যে তার গর্ভে পনেরটি খরগোশের বাচ্চা হয়েছে। মাঠে কাজ করতে করতে কোনো কারণে হঠাৎ ভয় পেয়ে নাকি তার গর্ভ পরিবর্তন হয় ; এই ব্যাখ্যা শুনে অনেকেরই আর কোনো কষ্ট হয় নি তার গল্প মেনে নিতে, তাবলে প্রমাণ দাখিল করতে সে কার্পণ্য করে নি। কয়েকটি খরগোশের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পর্যন্ত নাকি সে দেখাতে

সমর্থ হয়েছিল—এমন প্রত্যক্ষ সাক্ষ্যের পরেও যাদের মনে সন্দেহ থাকে তারা নিশ্চয় চন্দ্রস্থর্যেও অবিশ্বাস করতে পারে। অবশ্য কিছু দিন পরে বুজরুকি ধরা পড়ল, কিন্তু তার আগে অনেক বই ছাপা হল এবং স্বয়ং দেশের রাজাকে সম্ভাবনাটা এতখানি ভাবিয়ে তুলেছিল যে তিনি পণ্ডিতদের ডেকে হুকুম করেছিলেন অনুসন্ধান করতে।

অবশ্য এ বহুদিনের ঘটনা। আধুনিক সভ্য মানুষ এখন আজগুবী গল্প সহজে হজম করে না, যা বিশ্বাস করা চলে তাই তারা গ্রহণ করে। যথা, ১৯৩৩-৩৪ সালে আমেরিকার অতলান্তিক উপকূলে এক 'সত্যি ঘটনা' প্রচলিত ছিল যে এক মানুষের মেয়ে অক্টোপাসের ডিম পেড়েছে। ১৯৪৫ সালে ঐ দেশেরই এক প্রোফেসার মানুষের গর্ভে মানুষ সন্তান সম্বন্ধেই এক সারগর্ভ কথা বলেছিলেন; তার মতে সমাজের অনেক উন্নতি সম্ভব যদি মায়েরা গর্ভাবস্থাতেই সন্তানকে সদুপদেশ দিতে আরম্ভ করেন। এই ধরণের উক্তি শুনলে সমাজের যে উন্নতি দরকার তাতে আর সন্দেহ থাকে না এবং মনে হয় ভাবী মাতারা সর্বাগ্রে এই উপদেশ দিয়ে পরীক্ষাটা আরম্ভ করলে ভাল হয়: 'বাছা, সাবালক হওয়ার পর আর বাজে বকিয়ো না'।

এই একঘেয়ে পুরনো পৃথিবীতে এ যুগে আর নতুন কিছু বড় একটা ঘটে না, তাই সম্প্রতি বাইরের জ্যোতির্লোক থেকে অলৌকিকের আমদানি হচ্ছে। কয়েক বছর আগে নিউ ইয়র্ক শহরের এক বেতারে প্রচারিত হয়েছিল মঙ্গলগ্রহবাসীদের পৃথিবী আক্রমণের ভয়ংকর সংবাদ। দিক্‌ভ্রান্ত পলায়নরত নাগরিকদের বেশ কিছুক্ষণ খেলিয়ে প্রকাশ করা হল যে আসলে ঐ বেতারবার্তা এক কল্পনাপ্রবণ অভিনেতার পরিহাস মাত্র।

গত যুদ্ধের পর থেকে কিন্তু আমরা অপার্থিব আগন্তুকের অনেক

চাক্ষুষ প্রমাণ পেয়েছি। আমেরিকাতেই রকমারি উড়ো পিরিচ বা flying saucer আবির্ভূত হয় সবচেয়ে ঘন ঘন, কিন্তু অন্যান্য জায়গা থেকেও এত 'প্রত্যক্ষ বিবরণ' পাওয়া গেছে যে মনে হয় ও জিনিসটা দেখে নি এমন লোকের সংখ্যা জগতে আজ নগণ্য। গল্পগুলিও ক্রমশ অধিকতর চমকপ্রদ হয়ে উঠছে। আমেরিকার এক খবর-কাগজে পড়েছিলাম এক উড়ো পিরিচ ভেঙে পড়ার খবর। জাহাজের মধ্যে ছিল শুক্রগ্রহের কয়েকটি বাসিন্দা, দৈর্ঘ্যে তারা মাত্র চার ফুট। দুঃখের বিষয় পতনে এই ক্ষুদ্র মানুষদের মৃত্যু হয়। এখনো নাকি কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে স্পিরিটে রক্ষিত আছে তাদের দেহ—অবশ্য গোপনে, সাধারণের দৃষ্টির বাইরে।

কিন্তু সম্প্রতি এই রহস্যের সম্পূর্ণ সমাধান করেছেন আর একজন আমেরিকান। ইনি এক শুক্রগ্রহবাসীর সঙ্গে মুখোমুখি আলাপের কাহিনী লিখেছেন এক বইতে। ভিন্ন জগতের ঐ লোকটি প্রায় আমাদেরই মত দেখতে, তবে মাথার চুল লম্বা আর পরনে অনেকটা শালোয়ারের মত পাজামা। সৌন্দর্য, বুদ্ধি ও প্রেমের প্রতিমূর্তি সে। প্রধানত হাতের ইঙ্গিতেই তার সঙ্গে অত্যন্ত জটিল প্রশ্নোত্তরও সম্ভব হল, জানা গেল সূর্যের অন্যান্য সব গ্রহতে আমাদেরই মত মানুষ আছে এবং তারা সকলে অনায়াসে পরস্পরের এলাকায় যাতায়াত করে। তৃতীয় গ্রহ পৃথিবীর ভাগ্যে এই অক্ষমতার অভিশাপ কি অপরাধে তা লেখক জিজ্ঞাসা করেন নি, তবে এই বই পড়ে বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় না যে আমাদের মত নির্বোধ মানুষ আর কোনো জগতেই থাকতে পারে না।

লেখকের কাহিনী যে এক বর্ণও মিথ্যা নয় বলা বাহুল্য তার যথেষ্ট প্রমাণ দেওয়া হয়েছে। সঙ্গে ক্যামেরা থাকা সত্ত্বেও ছবি উনি নিতে পারেন নি অবশ্য কারণ আগন্তুক তাতে আপত্তি করেছে, তবে হাতে

এঁকে দিয়েছেন মানুষটির ছবি। তাছাড়া আছে তার পদচিহ্নের ছাঁচ এবং লেখকের যে কয়েকজন সঙ্গী দূরে দাঁড়িয়ে দেখেছিল সেই অলৌকিক দৃশ্য তাদের প্রতিজ্ঞাবাক্য। শুক্রগ্রহের এই টুরিস্ট পৃথিবীতে পা দেবার আগেই লেখক দিব্যশক্তিতে জানতে পেরেছিলেন যে শুধু তার সঙ্গে দেখা করতেই সে আসছে। সুতরাং পৃথিবীর অন্যান্য ভাগ্যহীনেরা যে আজ পর্যন্ত এমন কোনো লোকের সাক্ষাৎ পায় নি তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কিন্তু তারা যাতে তার বিস্ময়কর অভিজ্ঞতার কিছুটা স্বাদ অন্তত পেতে পারে সেজন্য ঐ অদ্বিতীয় পুরুষ লিখেছেন বই। বস্তুত বই লেখার মধ্যে তার আর কোনো উদ্দেশ্যই ছিল না।

ধর্মের কল

পৃথিবীতে যুগে যুগে ধর্মগুরুরা অবতীর্ণ হয়েছেন, মানবের কল্যাণ ও মুক্তির জন্য অহিংসা ও প্রেমের বাণী রেখে গেছেন। তাঁদের তিরোধানের পর প্রায়ই শিষ্যদের মধ্যে দেখা দিয়েছে গুরুবাণীর ব্যাখ্যা নিয়ে মতদ্বৈধ, ধর্মের ঐক্য ফেটে চৌচির হয়েছে। তাতে কিন্তু ধার্মিকতা ক্ষুণ্ণ হয়নি, বরং বহু ক্ষুদ্র ধর্মের প্রতিযোগিতায় উত্তেজনা আরো বেড়েছে। প্রতি ভগ্নাংশের পূজারীরা দরকার হলে বিরুদ্ধ-বাদীদের মাথায় গজাল মেরে পর্যন্ত নিজেদের মাহাত্ম্য ঢুকিয়ে দিতে চেষ্টা করেছেন। আবার যখন সম্পূর্ণ বিজাতীয় কোনো ধর্মের সঙ্গে তর্ক বেঁধেছে তখন এরাই গলাগলি হয়ে গুরুদেবের ধ্বজা তুলে ধরে যবন-রক্তের স্রোত বইয়ে দিয়েছে, আজো দিচ্ছে।

এ দেশে শুধু প্রাণ নিতে নয়, ধর্মের জন্য প্রাণ দিতেও পারি আমরা। বিগত কুম্ভমেলায় কয়েকশো লোক পায়ের তলায় প্রাণ হারিয়ে আবার তা দেখিয়েছে। যেখানে এই ঐহিক (secular) রাষ্ট্রের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের মধ্যে পুণ্য মুহূর্তে জলে ডুব দেবার জন্য কাড়াকাড়ি পড়ে যায় সেখানে ঐ প্রজাদের অদৃষ্টে বোধহয় আশ্চর্য হবার কিছু নেই। তাছাড়া তারা নিশ্চয় অতি দ্রুত স্বর্গে গেছে, রোগশয্যায় মরলে তা হত না।

এসব দেখে শুনে বিশ্বের লোক জানে আমরা অতি ধর্মপ্রাণ জাতি, সেজন্য ধর্মের জন্য আমরা যে অন্যান্য জাতির চেয়ে বেশী লড়ব, দরকার হলে প্রাণ দেব ও নেব তা আর আশ্চর্য কি। তাই বিদেশী যদি কটাক্ষ করে বলে আমাদের দেশে ধর্মের জন্য মাথা ফাটাফাটি ও

দুর্ঘটনা লেগেই আছে তবে ঐ হিংসুক ম্লেচ্ছদের কথায় কান দেবার দরকার নেই।

কিছু দিন আগে নেহেরু এসেছিলেন পাঞ্জাবের এক গুরুদ্বারে গুরু গোবিন্দ সিংহের দুই পুত্রের মৃত্যু-বার্ষিকী উপলক্ষে। কিন্তু রাজনৈতিক মতভেদের জন্য জনসাধারণ তাকে ঢিল মেরে তাড়ালে, কোনো কথা বলতে দিলে না। তারপর অশ্রুপূর্ণ ভক্তরা মিছিল করে চলল গুরুপুত্রদের মন্দিরের দিকে। এরা দুজন প্রাণ দিয়েছিলেন মোগলদের হাতে, তারাও ঢিল মেরে এদের হত্যা করেছিল।

মহাত্মা গান্ধিও নিজের জীবদ্দশায় এই ধরণের ভক্তি দেখে গেছেন অনেকবার। তাঁর অহিংসা মন্ত্রে এতই আমাদের গভীর বিশ্বাস ছিল যে সেই মন্ত্রের প্রতিষ্ঠার জন্য বারে বারে আমরা মাথা ফাটিয়েছি। মৃত্যুর পর জাতির জনক বলে তাঁকে আমরা পূজা করছি, বিদেশের লোককে বলছি তাঁর আদর্শ ছাড়া মানুষের আজ আর বাঁচার পথ নেই। অথচ আমাদের সরকারী বা বেসরকারী নীতিতে গান্ধিবাদ হয়ে দাঁড়িয়েছে বিশ্বের সম্ভ্রম আদায়ের বস্তু মাত্র। পৃথিবীর প্রদর্শনীতে ভারতের চমকপ্রদ দান, কাঁচের জানলায় পরম যত্নে সাজানো। কিন্তু তার বেশী কিছু নয়, বাইরের বাস্তব জগতে গান্ধিবাদ প্রয়োগের সম্ভাবনা 'কাজের লোকেরা' মূহূর্তের জন্যও মনে স্থান দেন না। তাই ভারত একদিকে যদিও অহিংসা ও বিশ্বশান্তি সম্বন্ধে জগতকে ঘন ঘন উপদেশ দেয়, অন্যদিকে তার স্বাধীনতা দিবসে অন্যান্য দেশের মতই সামরিক শক্তির পেশী সঞ্চালন দেখা যায় রাজধানীতে। তাও যদি এসব ঠুনকো অস্ত্রের কোনো দাম থাকত এই হাইড্রোজেন বোমার যুগে!

যেমন বাইরে, তেমন ঘরে। এক এক সময় আমরা পূজা-অর্চায় এত ধার্মিক যে দৈনন্দিন জীবনে সাধারণ নৈতিক ব্যবহারের

দিকে নজর দেবার দরকারই করে না। আমাদের শিক্ষিত সমাজেও যারা ঘুষ নেয় বা নানা উপায়ে সরকারকে ঠকায় তারা অবশ্য সেটা করে নেহাতই দায়ে পড়ে—চারপাশের সব লোক অসাধু হলে তাদেরও তা না হয়ে উপায় কি। এখানে নীতির প্রশ্ন নয়, বোকামির প্রশ্ন। অনেকে নিশ্চয় নিজের স্খলনের জন্য বিধাতাকেও দায়ী করে থাকে—কেন তাঁর বিধানে ধর্ম কেবলই বিরস আর অধর্ম সর্বদা সরস!

অহিংসার জন্য মানুষ মারতে রাজী থাকলেও অহিংসা যে আসলে কতখানি আমাদের মজ্জাগত তা দেখা যায় অন্যত্র। ইতর প্রাণীর প্রতি আমাদের যেমন দরদ এমন আর কোথাও না। পঙ্গপাল খেতের পর খেত ধ্বংস করে চলেছে, যেতে যেতে খাদে পড়ে দাপাদাপি করছে দেখে ভারতীয় চাষীর প্রাণ কেঁদে ওঠে, তাড়াতাড়ি সে সেতু বানায় সামান্য পতঙ্গের জন্য। শস্য যদি নাই থাকে ঘরে তবে যারা কীটের জন্য পর্যন্ত স্বার্থত্যাগ করে বিদেশীরা কি দুমুঠো ভিক্ষা দেবে না তাদের! অবশ্য যেমন রাজা তেমন প্রজা। নেতারা যদি পথ না দেখাতেন তবে আমরা এতখানি অহিংস কখনো হতে পারতাম না। যেমন একটা দৃষ্টান্ত: আমরা জানি দেশে দেশে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কৃত্রিম প্রজননের ফলে পশু লালনের অনেক উন্নতি হয়েছে; কিন্তু একবার এক কংগ্রেস-মন্ত্রী তার প্রদেশে ঐ ব্যবহার নামঞ্জুর করেছিলেন কারণ ওতে নাকি ষাঁড়কে তার ন্যায়সঙ্গত প্রাপ্যের থেকে বঞ্চিত করা হয়। আমরা চাই আমাদের স্বাস্থ্যপূর্ণ গরু জন্মাক, বেশী দুধ দিক এবং তার থেকে আমাদের ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্য ভাল হক; কিন্তু নিজের স্বার্থের জন্য তাবলে অসহায় মূক প্রাণীদের বঞ্চনা করতে রাজী নই।

শুধু পশুজগতের প্রতিই নয়, এমন কি যা জন্মায় নি কিন্তু জন্মাতে পারত, হয় নি কিন্তু হতে পারত তার প্রতিও আমাদের অসীম দরদ। আজ দেশের সাচ্ছল্যের পথে সবচেয়ে বড় ও ভয়ংকর কণ্টক লোকবৃদ্ধির অবাধ গতি। কিন্তু কেউ যদি সাহস করে বলতে চায় যে ঐখানে রাশ টানা দরকার তখনি চতুর্দিক থেকে তীব্র আপত্তি শোনা যায় বিবিধ নেতার, এমন কি অনেক বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকেরও। এদের মতে চাষ ও শিল্প বাণিজ্যের উন্নতির ফলে দেশে রামরাজ্য কেউ ঠেকাতে পারে না, প্রতিদিন যে দশ হাজার করে লোক বাড়ছে তা সত্ত্বেও। সরকারী ও বেসরকারী নেতারা প্রায়ই উচ্চকণ্ঠে বলে থাকেন যে লোকবৃদ্ধির ভয় জুজুর ভয় মাত্র, দেশের সম্ভাব্য সম্পদ সব ভাবনা দূর করবে। এতখানি অলৌকিক দিব্যদৃষ্টির যারা অধিকারী নয় জবাবে তারা বলে—হয়তো হবে, কিন্তু কি দরকার অনাবশ্যক বিপদের সম্ভাবনাকে রেখে, চিরদিন কেবলই খাদ্য আর লোকবৃদ্ধির প্রতিযোগিতায় শক্তিক্ষয় করে। দেশে যদি সোনা ফলে তো যারা থাকবে তাদেরই ভাগ করে দিলে কি অতিমাত্রায় বাবু হয়ে পড়ার আশঙ্কা আছে? কিন্তু এসব যুক্তি বিরুদ্ধবাদীদের মনে রেখাপাত করে না। এদের এই আশ্চর্য দৃঢ়তার কারণ সম্বন্ধে বহুদিনের সুগভীর চিন্তার পর আমি এই সিদ্ধান্তে এসেছি যে এ মনোবৃত্তি আমাদের অন্তর্নিহিত অহিংস প্রবৃত্তিরই ফল—তা এতই অন্তর্নিহিত যে যে হয়েছে এবং যে হতে পারত তাদের আমরা একই চোখে দেখি। এই সুন্দরী বসুন্ধরার রূপ রস বর্ণ গন্ধের থেকে এতগুলি মানুষকে বঞ্চিত করা (যদিও দারিদ্র্যের অন্ধকূপে কোনো সৌন্দর্যই তাদের কাছে পৌঁছাবে না) প্রায় এতগুলি মানুষকে খুন করারই তুল্য।

এখানে হয়তো অনেকেরই জিহ্বাগ্রে এই প্রত্যুত্তর যে আমাদের

দেশে জন্ম-নিয়ন্ত্রণ নীতি সরকারী ভাবে গ্রহণ করা হয়েছে, বোধহয় এক জাপান ছাড়া জগতের আর কোনো দেশে যা এ পর্যন্ত হয় নি। কিন্তু এ নীতির এক অতি সংকীর্ণ ক্ষেত্রই সরকার মেনেছে এবং ঐ আংশিক মানার পিছনেও উদ্যোগ এত সামান্য যে মনে হয় সরকার তাও গ্রহণ করেছে নেহাত দায়-সারা ভাবে, নিতান্তই সাংকেতিক তার তাৎপর্য। কিছু দিন আগে এক সন্ধ্যায় রেডিও খুলে এই প্রসঙ্গে এক বক্তৃতা কানে এল। তার শুরুটা শুনি নি, কিন্তু বুঝতে দেরি হল না যে বক্তা জন্ম-নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে। তার 'যুক্তি'র মধ্যে ভারতের আধ্যাত্মিক শক্তি ও নিজস্ব ঐতিহ্য ইত্যাদির উল্লেখ তো ছিলই, হঠাৎ তিনি বৃহৎ পরিবারের আদর্শ তুলে ধরলেন এই অজুহাতে যে ঐ সব ঘরের সন্তানরা একত্র বাস করতে শেখে বলে ভাল নাগরিক হয় (সিভিল কোর্টের নজির কি এ কথা সমর্থন করবে ?)। সেই কারণেই নাকি বহু বাপ মা ইচ্ছে করে দারিদ্র্য বরণ করেন কুরুকুলনিন্দিত সংসারের খাতিরে (তাদের তুলনায় যারা অনিচ্ছা সত্ত্বেও ধৃতরাষ্ট্রকে হার মানায় সেই দলটা কত বড় ?)। পরিশেষে শুনতে হল সেই অবশ্যম্ভাবী অকাট্য যুক্তি যে আর্থিক সাচ্ছল্যের সঙ্গে সঙ্গে জন্ম-হার আপনা থেকেই কমে যাবে। ঐ দুটো জিনিস যে পরস্পরের লেজ কামড়ে বসে 'দুষ্ট চক্র' বা vicious circle সৃষ্টি করেছে সেই সমস্যার মীমাংসা অবশ্য তিনি কিছু দিলেন না। বক্তৃতার শেষে জানা গেল যে বক্তা ভারত সরকারের এক শীর্ষস্থানীয় V.I.P. এবং তিনি নাকি জন্ম-নিয়ন্ত্রণের স্বপক্ষেই বলছিলেন।

এই ধরণের ধর্মালুতার জন্যই আমাদের অস্পৃশ্যতা, বালবিবাহ ইত্যাদিও এতদিন ধরে চলে এসেছে, যার জন্য বিশ্বের কটূক্তি

এখনো শুনতে হয়। অবশ্য সেখানে আমাদেরও ভুকথা বলার আছে। বিদেশীরা এখনো বলে যে ভারতে অস্পৃশ্যতা আজ বেআইনী হলেও বস্তুত তার প্রভাব রয়েছে প্রায় আগের মতই। কিন্তু ক্যাথরিন মেয়োর দেশ আমেরিকার কোনো কোনো প্রদেশে নিগ্রোর নিগ্রহ ও পার্থক্য এখনো আইনসঙ্গত। জাতি বর্ণ নির্বিচারে সব নাগরিকের সুযোগ অধিকার সমান হবে এই মৌখিক প্রস্তাবও দেখেছি গ্রহণ করতে রাজী হন না সাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা। সতেরটি প্রদেশে এবং দেশের রাজধানীতে শ্বেত ও নিগ্রো ছাত্রের এক স্কুলে শিক্ষা নিষেধ *। ওরা বলে ব্যবস্থা 'পৃথক কিন্তু সমান'। কিন্তু পার্থক্য থাকলেই তা অসমান, অপমানকর। কেন্দ্রীয় আদালত এই সেদিন এই কারণে স্কুল ব্যবস্থার সংশোধনের নির্দেশ দেওয়াতে ঐ সব প্রদেশের কংগ্রেস-সদস্যরা ভয় দেখিয়েছেন যে প্রাদেশিক আইনে হস্তক্ষেপ তারা বরদাস্ত করবেন না। আমেরিকার ছটি প্রদেশে বারো বছরে মেয়েরা বিয়ে করতে পারে, দশটি প্রদেশে চৌদ্দ বছরে; আমাদের তবু আছে সর্দা আইন। দেশে আইন থাকলে অন্তত এটুকু বোঝা যায় যে রাষ্ট্রের আদর্শটা নৈতিক, সাধারণ লোক অসুংস্কৃত হলেও।

ধর্ম এ দেশে অনেক বিভেদ এনেছে, কিন্তু খৃষ্টানদেরও আজ অনেক শাখা প্রশাখা, দেশে দেশে কত বিভিন্ন গোত্রের গির্জা। আমরা বহু দেবতার পূজারী বলে নিন্দিত, ওরা ভজন করে অনেক patron saint বা মহাত্মার। এঁদের প্রতি ভক্তের মানত, এঁদের উদ্দেশ্যে মোমবাতি জ্বেলে উপাসনা অনেকটা আমাদের রীতিরই মত। পৌত্তলিকতার কটাক্ষও আমাদের সইতে হয়, কিন্তু ইটালি ও অন্যান্য ক্যাথলিক দেশে বেড়াতে বেড়াতে কোনো গির্জায় ঢুকলে

* সম্প্রতি ওআশিংটনের স্কুলগুলি নিগ্রো গ্রহণ করায় ভীষণ প্রতিবাদ-আন্দোলন আরম্ভ হয়েছে।

প্রায়ই দেখা যায় ঐ সব মূর্তির সামনে প্রার্থনারত ভক্তদের, এবং তখন আমাদের মূর্তি পূজার কথাই মনে হয়।

ধর্মসংক্রান্ত ঠাট বা অনুষ্ঠানেও ওরা বোধহয় আমাদের খুব পিছনে পড়ে নেই। শুদ্ধ জল, মন্ত্র পাঠ, বিশেষ পোশাক, জটিল অঙ্গসঞ্চালন সবই আছে। বিশেষত ইংলণ্ডের কোনো রাজকীয় অনুষ্ঠানের দৈর্ঘ্য ও জটিলতা বোধহয় আমাদের সব কিছুকে হার মানাবে। রাজাকে মুকুট পরাতে হলে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি চলে এক বছর ধরে, বহু সময় ও অর্থ ব্যয় হয় গির্জার ভিতরে বিভিন্ন শ্রেণীর দর্শকের স্থান, তাদের পোশাক শিরস্ত্রাণ নড়াচড়া ইত্যাদির নির্বাচনে। তাছাড়া কড়া নিয়মে বাঁধা আছে অভিষেকের প্রতিটি ক্ষুদ্র অনুষ্ঠান—ধর্মগুরুদের নানাবিধ মন্ত্রোচ্চারণ ও বিবিধ সাংকেতিক অঙ্গভঙ্গি, নানারকম প্রাবাদিক ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ জিনিস ছুঁয়ে রাজ্যাধিপতির বিভিন্ন প্রতিজ্ঞা। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সাড়ম্বর গাম্ভীর্যে দেশের শীর্ষস্থানীয় বিচক্ষণ ব্যক্তিরা এই খেলা খেলে চলেছেন, আত্মনিবেদনে মাটির সঙ্গে মিশে যাচ্ছেন এক ব্যক্তির সামনে যিনি সম্ভবত বয়সে, বুদ্ধিতে গুণে ও ক্ষমতায় এদের অনেক ছোট—দেখলে এদের একদল বয়স্ক শিশু বলেই মনে হয়। বোধহয় রাজা যতদিন থাকবে কোনো দেশে তাকে ঘিরে এই ধরণের গদগদ আত্মদান ও আড়ম্বরও থাকবে। এ জিনিস দেখে আমি কখনো বিস্ময় রোধ করতে পারি না—আমার মনে হয় যে রক্তমাংসের মানুষকে বেদীতে বসানোর চেয়ে মাটির পুতুলের পূজা অনেক শোভন ও স্বাভাবিক। তার মধ্যে রূপকথার ছোঁয়া আছে, মানুষের পূজায় তা নেই।

দেশে দেশে ধর্মের ইতিকথা আজ এই বিজ্ঞানের যুগে দ্রুত পরিণত হচ্ছে পুরাণে ও সাহিত্যে। নাগরাজ বাসুকির মাথায় যে পৃথিবী রক্ষিত অথবা সমুদ্রমন্থনের গল্প আমাদের পূর্বপুরুষরা নিশ্চয়

বিশ্বাস করতেন, আজ কম লোকেই করে। পাশ্চাত্য পুরাণে যেমন আছে নোয়া-র কাহিনী; প্রবল প্লাবনে ধরণী ডুবে যাচ্ছে, সৃষ্টিতে প্রাণ বাঁচিয়ে রাখার জন্য নোয়া তুলে নিল তার তরণীতে নিজের পরিবার আর প্রত্যেক প্রাণীর একটি পুরুষ ও স্ত্রী, ভাসতে ভাসতে এসে ঠেকল মধ্যপ্রাচ্যের আরারাত পর্বতে। বেশ রোমাঞ্চকর রূপকথা, পড়তে ভালই লাগে। কিন্তু এই ১৯৪৪ সালে নাকি আরারাত পর্বতে বিশ্ব-ঠাকুর্দার ঐ নৌকা দেখতে পাওয়া গেছে তুষার-নিমজ্জিত অবস্থায়। দেখেছে এক সোভিয়েট বৈমানিক—যার দেশে বাইবেলের রূপকথা বিশ্বাস করাই নিষিদ্ধ। এ সম্বন্ধে এখনো বই ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হচ্ছে, এবং যারা সেসব কিনে পড়ছে তারা সকলেই নিশ্চয় এ দেশের লোকের মত নিরক্ষর ও অজ্ঞ নয়।

১৮৫৯ সালে ডারুইন যখন বললেন যে ক্রমবিবর্তনের পথে নর ও বানরের পূর্বপুরুষ একই, তখন পাশ্চাত্য জগতে যে আণবিক বোমাপাত হল আজও তার প্রতিধ্বনি মাঝে মাঝে শোনা যায়। সৃষ্টিতে ইতর থেকে উচ্চতরের উদ্ভব আর সব প্রাণীর বেলায় বিশ্বাস করা যেতে পারে কিন্তু 'সবাই জানে' মানুষকে ঈশ্বর নিজের মূর্তিতে আলাদা করে গড়েছিলেন! খুব বেশীদিন হয়নি ইংলণ্ডের এক যাজক এই অবিসংবাদিত ঐতিহাসিক আবিষ্কারের প্রতি সামান্য সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন বলে প্রচণ্ড প্রতিবাদের ঝড় বয়ে গেল। এই সেদিন আমেরিকার টেনেসী প্রদেশে এক নবীন শিক্ষক ক্লাসের ছেলেদের ক্রমবিবর্তন সম্বন্ধে বিজ্ঞানসম্মত দুকথা বলেছিলেন বলে তাকে আদালত পর্যন্ত টেনে আনা হয়েছিল।

এসব দেখলে কি সত্যিই সন্দেহ থাকে যে শিম্পাঞ্জি, বেবুন বা গরিলার সঙ্গে আমাদের খুব নিকট সম্পর্ক! এমন কি ওরাই হয়তো আপত্তি করতে পারে আমাদের মাসতুতো ভাই বলে মানতেও।

কে বড়

দেশে দেশে মেয়েরা আজ জেগেছে সমান অধিকারের দাবি নিয়ে। তারা চাকরিতে পুরুষদের সঙ্গে এক মাইনে চায়, আবার বাসে ট্রামে পুরুষরা জায়গা ছেড়ে উঠে না দাঁড়ালে মনে মনে বর্বরদের মুণ্ডপাত করে। মেয়েদের তোয়াজ ও খাতির করা অবশ্য পাশ্চাত্য সভ্যতার এক বড় অংশ। তাদের জন্য দরজা খুলে ধরা, তাদের হাতের ভার বওয়া, তারা যতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে ততক্ষণ চেয়ার ছেড়ে খাড়া হয়ে থাকা এসব ওরা শেখে প্রায় বর্ণমালা শেখার আগেই। 'মেয়েরা আগে' এই নীতি শুধু বক্তৃতার সম্ভাষণেই নয়, সর্বত্রই মানতে হয়। অবশ্য সব নিয়মের মত এরও ছু একটি আশ্চর্য ব্যতিক্রম চোখে পড়ে। শিষ্টতা ও ব্যবহার-রীতিতে ফরাসীদেশ পাশ্চাত্যের আদর্শ—বিশেষত মেয়েদের যেমন আদর তাদের সমাজে এমন আর কোথাও নয়। পোশাক আর প্রসাধনে ফরাসী ললনা যেমন বিশ্বনারীর নেত্রী, সমাজের পুরুষরাও তেমনি তাদের ঘিরে রেখেছে এক আধ-মানুষ আধ-দেবীর আদর্শে। অথচ সে দেশেই পুরুষ ও নারীকে একত্রে অভ্যর্থনা বা বিদায় সম্ভাষণ করতে সবাই আগে নাম করে ভদ্রলোকের, —যথা সুপ্রভাতের সময় Bon jour, monsieur dame।

সে যাই হক, পুরুষের এই লোক-দেখানো পিঠ-চাপড়ানো আদর আপ্যায়নে ও মৌখিক তোয়াজে মেয়েরা আর ভুলতে রাজী নয়। তারা জানে যে আসলে ওটা বাইরের এক চোখ-ঠারা প্রলেপ মাত্র, ভিতরে ভিতরে দাম্ভিক পুরুষ বরাবর নারীকে নিজের নিকৃষ্ট বলেই ধরে এসেছে। একদা মেয়েরা 'দুর্বল ও ভঙ্গুর' হয়েই তুষ্ট ও গর্বিত ছিল, কিন্তু দিনকাল বদলে গেছে, রণক্ষেত্রে নেমেছে তারা আজ।

আমাদের মেয়েরাও জেগেছে, 'নামিয়ে চক্ষু মাথায় ঘোমটা টেনে' তারা আর নির্বাক হয়ে নেই। কিন্তু পশ্চিমের বোনদের তুলনায় এখনো তারা নেহাতই পাড়াগেঁয়ে। ইংলণ্ডের গৃহিণীরা সেদিন সমিতি গঠন করে দাবি করেছিল যে স্বামীর উপার্জনের একটা অংশ তাদের প্রাপ্য—ঘরের কাজের জন্য চাকরানীকে যদি মাইনে দিতে হয় তবে তারাই বা কেন সেটা পাবে না। কর্তৃপক্ষ নাকি এই দাবি ন্যায়সঙ্গত বলে মেনেছে। কিন্তু এই প্রগতির যুদ্ধে আজ বোধহয় আমেরিকান নারীই সাম্য ও স্বাধীনতার ধ্বজা সবচেয়ে উঁচুতে তুলে ধরেছে। কিছু দিন আগেও আমার ধারণা ছিল যে ক্যানাডা ও আমেরিকার সামাজিক জীবনে পার্থক্য সামান্যই, কিন্তু সে ভুল ভাঙল ক্যানাডায় বাসকালে ওদের এক সাপ্তাহিক পত্রিকায় এক প্রবন্ধ পড়ে। প্রবন্ধটি কয়েকজন আমেরিকান তরুণী পত্রের আকারে লিখেছেন ক্যানেডিয়ান ভগ্নীদের উদ্দেশ্য করে। কেন তারা এত পিছনে পড়ে আছে, কেন তারা স্বামীর সঙ্গে সমান ভাবে ভাগ করে নেয় না নিজেদের দৈনন্দিন দুর্ভোগগুলি এই তাদের অভিযোগ ও তিরস্কার। লেখিকারা সগর্বে জানিয়েছেন যে তাদের সংসারে আর ঐ জাতীয় অন্যায়ের স্থান নেই। স্বামীরা যে সারাদিন আপিশে মজা করে ঘরে এসে খবর-কাগজ নিয়ে সোফায় পা তুলে দিয়ে মুখে পাইপ গুঁজে বসবে তা আর হবার উপায় নেই। স্বামীদের তারা সান্ধ্য স্কুলে পাঠিয়েছে ঘরের কাজ শেখার জন্য। বাসন ধোয়া, ঘর পরিষ্কার রাখা, রান্না করা, বেবির যত্ন করা এসবের জন্য আগে মেয়েদেরই স্কুল ছিল, এখন পুরুষদেরও হয়েছে।

শুনেছিলাম জাগরনী সংঘের নেত্রীরা নাকি এই দাবিও বিবেচনা করছে যে গর্ভধারণের ব্যাপারেও পুরুষকে ভাগ নিতে হবে। ওটা অত্যন্ত ঝামেলার ব্যাপার, অথচ যুগ যুগ ধরে মেয়েরাই খালি সন্তান

ধারণ করে আসছে আর পুরুষরা ফাঁকি দিয়েছে। 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি' এই মতলব ওদের সব কিছুতে। কিন্তু এই দাবি তারা শেষ পর্যন্ত পত্রিকায় পাঠায় নি কারণ ও দেশের এক ব্যবসায়ী কুবের আশ্বাস দিয়েছেন যে শিগগিরই তিনি এক যুগান্তকারী যন্ত্র ঘরে ঘরে বসাবেন রেফ্রিজারেটার বা কাপড়-কাচা কলের মত, তার ফলে মেয়েদের আর ন মাস ধরে বোঝা বয়ে বেড়াতে হবে না, সে কাজটা যন্ত্রেই করবে। এতে পুরুষরাও হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে এক অভাবনীয় দুঃস্বপ্নের কবল থেকে। আধুনিক জীবনের জটিল সমস্যার সমাধান করতে সত্যি বিজ্ঞানের মত জিনিস নেই।

নারীর এই যুদ্ধ ঘোষণায় স্বভাবতই পুরুষ শঙ্কিত হয়ে উঠেছিল। নারী যে নিকৃষ্ট সেটা এত স্বচ্ছ সত্য যে তা যে আবার প্রমাণ করতে হবে তা তার কখনো মনে হয় নি। কিন্তু পাকে পড়ে প্রমাণ খুঁজতে হল, শরীরতত্ত্ব মনস্তত্ত্ব জৈববিজ্ঞান খুঁড়ে খুঁড়ে কিন্তু বেরিয়ে এল কেঁচোর বদলে সাপ। কোথায় প্রমাণ হবে যে মেয়েরা পুরুষের সমান নয়, না দেখা গেল পুরুষই নারীর অধম। বেচারা পুরুষ আজ তাই মুখ চুন করে বসে আছে।

পশ্চিম জগৎ তার আবিষ্কারের বড়াই করে আর জ্ঞানগম্ভীর প্রবীণ প্রাচ্য আপন মনে হাসে। আজ ওরা বানিয়েছে উড়োজাহাজ আর চালিত বোমা, কত যুগ আগেই আমাদের ছিল পুষ্পকরথ আর শব্দভেদী বাণ। তেমনি পশ্চিমের চোখে পলিনেশিয়ার কোনো কোনো অঞ্চলে পৃথিবীর বর্বরতম লোকের বাস, অথচ তাদেরই সম্প্রদায়ে আদিম কাল থেকে প্রতিষ্ঠিত আছে পশ্চিমের নতুন আবিষ্কার এই নারীর শ্রেষ্ঠতা। ওদের মাতাকেন্দ্রিক সমাজে স্বামী নেয় স্ত্রীর নাম আর তার বাড়িতে আসে ঘর করতে। ঘরের কোণে সে পড়ে থাকে নিতান্তই অবহেলায়—মৌমাছির বা পিঁপড়ের সমাজে রাজা যেমন

রানীর পাশে নিতান্তই ক্ষুদ্র ও নগণ্য অনেকটা সেইরকম। মৌমাছি বা পিঁপড়ের থেকে যে মানুষের শেখার অনেক কিছু আছে তা আমরা ছোটবেলায় 'কথামালা'র থেকেই জেনেছি—এও আরেকটা দৃষ্টান্ত। সম্প্রতি বৈজ্ঞানিকরা আবিষ্কার করেছেন যে প্রশান্ত মহাসাগরের ঐ সব মাতাকেন্দ্রিক সংসারে এমন সুখশান্তি বিরাজ করে যা তথাকথিত সভ্য জগতের কোথাও দেখা যায় না।

নারীর শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে বিংশ শতাব্দীর এই যুগান্তকারী আবিষ্কার হয়তো অনেক পাঠকের—এমন কি এ দেশের অন্ধকারাচ্ছন্ন পাঠিকারও—বিশ্বাস হতে চাইবে না। সুতরাং বৈজ্ঞানিক তথ্য যা আমার হাতে আছে তার কিছুটা এখানে দাখিল করছি। এর অধিকাংশই এসেছে আমেরিকার বিবিধ গবেষণাগার থেকে, বোধহয় ও দেশেই এই প্রশ্ন নিয়ে বৈজ্ঞানিকরা সবচেয়ে বেশী চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন।

প্রথমে একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখাতে চাই নারীর নিকৃষ্টতা সম্বন্ধে বহু যুগের ভ্রান্ত ধারণা স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে সমাজে কেমন শিকড় ছড়িয়ে বসেছে। আমেরিকায় মনোবিদ্যার এক অধ্যাপক তার ১৪২ জন ছাত্রকে ও ১২৮ জন ছাত্রীকে তাদের মতামত জিজ্ঞাসা করেছিলেন পুরুষ মেয়ের মধ্যে ষোলটি স্বাভাবিক ধাতের আপেক্ষিক প্রাবল্য সম্বন্ধে। এগারোটি বিষয়ে দুই পক্ষের মতের মিল হয়েছিল। যথা, মেয়েদের থেকেই গোলমাল ও বিপদের সূত্রপাত হয় বেশী (এতে ছাত্ররা বেশী জোর দিয়েছে ছাত্রীদের থেকে), মেয়েরা বাজে বকে বেশী, তাদের অনুভূতি সূক্ষ্মতর, তারা মারামারি পছন্দ করে না ; পুরুষদের বুদ্ধি বেশী, তারা অপর পক্ষের উপর বেশী নির্ভরশীল, তাদের প্রবৃত্তি অধিকতর প্রখর এবং স্থূল (মেয়েরা এই পার্থক্যের উপর বেশী জোর দিয়েছে) ; সাংসারিক জীবনে মেয়েদের স্বার্থত্যাগ

বেশী ; এবং সব মিলিয়ে পুরুষই বড় (এতে দু পক্ষেরই সজোর সমর্থন)।

এর দু একটি বিষয়ে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার থেকে পাঠকের কিঞ্চিৎ সন্দেহের উদ্রেক হতে পারে। মারামারি পছন্দ না করার কথা যে বলা হয়েছে সেটা নিজেদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক কলহ বোধহয় বোঝাচ্ছে না। যাই হক, যেসব বিষয়ে ছেলেমেয়েতে মত মেলে নি তা হল : সাধারণ বুদ্ধি, অধ্যবসায়, একনিষ্ঠা, অপরের সঙ্গ-আসক্তি। এই বিষয়গুলি দু পক্ষই দাবি করেছে নিজেদের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য বলে। তাছাড়া ছেলেরা বলেছিল মেয়েরা শিশুদের মাথা খায়, কিন্তু প্রতিপক্ষ তা স্বীকার করে নি।

আগেই বলেছি এগুলি বৈজ্ঞানিক তথ্য নয়, মতামত বা সংস্কার মাত্র। আরেকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক মনোবিৎ পণ্ডিত যেমন বলেছেন যে পুরুষের মন সুখদুঃখে কম দোলায়মান ও বেশী ধীর স্থির বলে যে ধারণা তাও বাহ্যিক চেহারা জনিত সংস্কার মাত্র। আসলে তারাও একই রকম আবেগের বশবর্তী, কিন্তু 'পুরুষকার' বজায় রাখার জন্য বাইরে তা দেখায় না।

বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান অবশ্য এই ধরণের মতামত বা সনাতন সংস্কারের কোনো দাম দেয় না, তার ভিত্তি নিরপেক্ষ পরীক্ষার উপর। এক চিকিৎসালয়ের দুজন চক্ষুবিজ্ঞানী সম্প্রতি এই রকম এক গবেষণা শেষ করেছেন। এদের পরীক্ষার প্রশ্ন ছিল পুরুষ আর মেয়ের মধ্যে কে বেশী কাঁদতে পারে। এ বিষয়ে সাধারণ লোকের মনে অবশ্য কোনো প্রশ্ন নেই, কিন্তু বৈজ্ঞানিকরা সাধারণ লোক নন। তাই তারা ২৩১টি লোকের চোখের সঙ্গে জল-শোষা কাগজের লম্বা লম্বা টুকরো জুড়ে দিয়ে তাদের কাঁদাতে আরম্ভ করলেন (সেটা কি উপায়ে করলেন তা লেখেন নি কিন্তু)। ক্রমে সকলের চোখ যখন ফুলে জবাফুল

তখন কাগজে জল কতটা গড়িয়েছে তা মাপা হল। দেখা গেল ১৫ থেকে ২৯ বছর বয়স্কদের মধ্যে পুরুষের মাপ ১৩ মিলিমিটার আর মেয়েদের ২০—প্রায় দেড়গুণ বেশী। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু এই পার্থক্য ঘুচে যায় এবং ষাটের ঊর্ধ্বে পুরুষই সামান্য বেশী অশ্রুপূর্ণ। মেয়েদের ছিঁচকাঁদুনে বলে এতকাল যে আমরা কৃপা করে এসেছি দেখা গেল তা সাধারণ ভাবে প্রযোজ্য নয়। যাই হক, বয়সের সঙ্গে পুরুষ-প্রাণ নরম হয়ে পড়ে না নারী-হৃদয় কঠিন হয়ে ওঠে সে সম্বন্ধে ঐ পরীক্ষার থেকে কিছু বোঝা যায় নি।

ও দেশের এক সমাজতাত্ত্বিক গবেষণাগার থেকে প্রকাশিত এক সন্দর্ভে জানা যায় একচল্লিশটি বিষয়ে পুরুষের তুলনায় নারীর উৎকর্ষের তথ্য। মনোবিৎ ও শিশুবিজ্ঞানী পণ্ডিতরা খুব যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে সংখ্যাশাস্ত্রের নিয়ম অনুসারে অনেক স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের উপর এই অনুসন্ধান চালিয়েছিলেন; কোনো বিষয়েই ছেলেরা মেয়েদের হারাতে পারে নি। আমেরিকায় যারা পালিত সন্তান গ্রহণ করে তারা যে কন্যা পছন্দ করে বেশী পুত্রের চেয়ে এর পরে তাতে আর আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

এই পরীক্ষকদের প্রধান সিদ্ধান্তগুলি হল: জন্মের পরে খুকীদের স্বাস্থ্য খোকাদের চেয়ে ভাল, বিশেষত প্রথম দু বছর, এবং তাদের তুলনায় খোকারা শতকরা পঁচিশ ভাগ বেশী মরে যায়; খুকীদের দাঁত ওঠে আগে, তারা প্রায় দু সপ্তাহ আগে হাঁটতে শেখে, তাদের কান ভাল এবং তারা কথাও বোঝে আগে, ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ তাদের ভাল, তোতলামি কম এবং তারা পড়তে শেখে আগে। স্কুলের শিক্ষা যখন আরম্ভ হয় তখনো মেয়েরা উদ্যোগ, অধ্যবসায় ও মনোযোগের গুণে লেখাপড়া শেখে ভাল—তাছাড়া ছেলেদের মত তারা স্কুল পালায় না অত। এর ফলে তিন থেকে ছ বছর বয়সের

মধ্যে মেয়েদের তুলনায় ছেলেরা ফেল করে শতকরা বত্রিশ ভাগ বেশী, যদিও ক্লাসে প্রশ্ন করে থাকে তারাই বেশী। সাধারণ জ্ঞানের পরীক্ষাতেও মেয়েরা ছেলেদের হারিয়েছিল।

আবার এদিকে প্রায় নব্বই হাজার ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে স্কটল্যাণ্ডে কিছুদিন আগে এক পরীক্ষা হয়েছিল, তাতে কিন্তু দেখা গেছে যে উপরের এক-শতমাংশ ও নিচের এক-শতমাংশ এই দুই ভাগেই মেয়ের তুলনায় ছেলের সংখ্যা বেশী। অর্থাৎ ছেলেদের মধ্যেই সহজে মেলে খুব চালাক ও খুব বোকা। কিন্তু বোধহয় এসব ছাত্রছাত্রীদের বয়স বেশী ছিল।

আমেরিকার ঐ উপরোক্ত পরীক্ষায় স্বভাবের বিচারেও ছাত্ররা মোটেই পাত্তা পায় নি। দেখা গেল মেয়েরা বেশী স্নেহপ্রবণ, তারা হাসে সহজে, গোষ্ঠীর খাতিরে স্বার্থত্যাগ তাদের বেশী। দশ লক্ষ ডলার পেলে কে কি করবে এই প্রশ্নের উত্তরে পরের উপকারের ইচ্ছা জানিয়েছে মেয়েরাই বেশী। সৌন্দর্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্য-বিচারেও মেয়েদের নীতি সমাজের সঙ্গে খাপ খায় সহজে। তারা যে মিথ্যা কথা বলে তার মধ্যে শতকরা বত্রিশ ভাগ অপরকে বাঁচাবার জন্য, যেখানে ছেলেদের মধ্যে মাত্র আঠারো ভাগ। তাছাড়া হেরে গেলে তারা ছেলেদের মত দমে যায় না বা অত সহজে হাল ছেড়ে দেয় না।

বাপ মাকে জ্বালাতেও নাকি ছেলেরা বেশী ওস্তাদ। শিশুকালে তাদের বিছানার থেকে দু দণ্ড দূরে যাবার উপায় নেই ; খুকীরা মাকে কাছে না দেখলে তাদের মত অত সহজে কাঁদে না। খোকারা মায়ের কোলও ছাড়ে দেরি করে। তিন বছরের পরে ছেলেদের মারামারির প্রতি ঝোঁক বাড়ে ও তারা মেজাজ দেখাতে আরম্ভ করে। চার থেকে দশ বছরের মধ্যে শতকরা পঁয়ষট্টি জন ছেলে জেদী, যেখানে খুকীদের

প্রতি চার জনের মাত্র এক জন। ভয়ংকর জন্তু জানোয়ার ও ডাকাতের দুঃস্বপ্নে ছেলেদের ঘুম অস্থির, কিন্তু তাদের বোনেরা ঘুমায় নিবিড় শান্তিতে। শারীরিক আঘাতকেও ছেলেরা বেশী ডরায়।

এত কথার পর অবাক লাগে এই দেখে যে মা ষষ্ঠী দেশে দেশে পুত্র-ভিক্ষার দরখাস্তই বেশী পেয়ে থাকেন। মেয়ে হয়েছে শুনলে যেসব বাপ বানপ্রস্থের কথাটা নতুন করে বিবেচনা করতে আরম্ভ করেন তাদের সহধর্মিণীরা এখন ইচ্ছে করলে বেশ দুকথা শুনিয়ে দিতে পারেন। কিন্তু মা ষষ্ঠীর 'বিশ্বাসঘাতকতায়' তারাই হয়তো এত মুহ্যমান হয়ে পড়বেন যে বৈজ্ঞানিক বাক্‌যুদ্ধের ইচ্ছা তাদের আর থাকবে না।

আসলে মা ষষ্ঠীর দোষ নেই। পুরুষের প্রতিই তার কৃপাদৃষ্টি, কিন্তু যমরাজের নৃশংসতা তাকে হারায়। কয়েকটি সংখ্যা বিচার করলেই তা বোঝা যাবে। সব দেশের মিলিত গণনায় দেখা গেছে যে যদিও ১০০টি মেয়ে শিশুর তুলনায় পুরুষ শিশু গর্ভে আসে গড়ে ১৩০টি, জন্মের পর জীবন্ত শিশুর মধ্যে পুরুষের প্রাধান্য, দেশ ও জাতিভেদে, মোটে ১০৩ থেকে ১০৭। পাঁচ বছর যেতে না যেতে সংখ্যা হয়ে পড়ে সমান, যৌবনে বরং মেয়েদের সংখ্যাই সামান্য বেশী, এবং পাশ্চাত্য দেশে বার্ধক্যে প্রায় দ্বিগুণ। অধিকাংশ দেশেই পুরুষের তুলনায় স্ত্রীলোক যে সংখ্যায় সামান্য অধিক শুধু তাই না, মেয়েদের আয়ুও গড়ে তিন চার বছর বেশী প্রলম্বিত। ষষ্ঠ জর্জের মৃত্যুর পর ইংলণ্ডে বেঁচে ছিল তিন রানী, রাজা ছিল না একটিও।

ভারতে এবং প্রাচ্যের অন্যান্য দেশে বোধহয় এখনো গড়ে পুরুষের আয়ুই দীর্ঘতর, কিন্তু তার কারণটা সামাজিক। মেয়েদের স্বাস্থ্য আগে ভেঙে পড়ে, বিশেষ করে দরিদ্র শ্রেণীর মধ্যে, কারণ তারা ভাল খেতে পায় না। অর্থাৎ দুধ বা মাছের মুড়ো যদি জোটে তবে তা পতিদেবতা গ্রাস করেন। মধ্যবিত্ত ও উচ্চতর সমাজের মধ্যে কিন্তু

বিধবার সংখ্যা বিচার করলে দেখা যায় স্ত্রী পুরুষের আয়ু সম্বন্ধে জগতের সাধারণ নিয়ম এ দেশেও খাটে।

শরীরবিজ্ঞানীরা সন্দেহ করছেন যে বয়সের সঙ্গে যেসব রাসায়নিক পরিবর্তনের ফলে জরা ক্রমশ আক্রমণ করে আমাদের দেহ তা স্ত্রী পুরুষে কিছুটা বিভিন্ন। হৃদ্‌যন্ত্র ও রক্তচাপের রোগে ফুসফুসের ক্যানসারে স্ত্রীর তুলনায় পুরুষ তাই মরে অনেকগুণ বেশী। বেচারা পুরুষ! জীবনের শুরুতে যেমন সে দুর্বল, শেষেও তাই। এই সব আবিষ্কারের ফলে আমেরিকার এক চিকিৎসক দেশের মেয়েদের প্রতি আবেদন জানিয়েছিলেন তারা যেন এই ঠুনকো জাতটার প্রতি করুণাপূর্ণ ব্যবহার করেন, সংসারের ঝড় ঝাপটার থেকে সযত্নে আড়াল করে রাখেন এই মিটমিটে প্রাণশিখাকে।

প্রকৃতির এই পক্ষপাতিত্বে মনে হয় তাকে যে আমরা স্ত্রী বলে কল্পনা করি সেটা যথার্থ। তার হাতে পুরুষ সম্পূর্ণ অসহায়, কারণ দেহের প্রতিটি কোষে তার অভিশাপ আঁকা আছে। কোষের কেন্দ্রে যে অতি গুরুতর ক্রোমোসোম বা উত্তরাধিকার-সূত্র আছে স্ত্রীলোক পেয়েছে তার চব্বিশ জোড়া কিন্তু পুরুষের ভাগ্যে সাড়ে তেইশ। এই অসম্পূর্ণ জোড়াটাই যত নষ্টের গোড়া বলে জীববিৎরা আজ সন্দেহ করছেন। এই অভাবের ফলে পুরুষকে যে বংশবীজগুলি (gene) হারাতে হয়েছে তাতে জীবন-সংগ্রামে যেন তার একটা হাত কাটা।

অথচ এতকাল কবি আর দার্শনিকদের মুখে স্ত্রীলোকই শুনে এসেছে যে সে বিধাতার অসম্পূর্ণ সৃষ্টি। খৃষ্টান পুরাণে বলে আদামের এক পাঁজরা থেকে সে তৈরি, সুতরাং সে তো পুরুষের অংশ মাত্র। এখন দেখা যাচ্ছে পুরুষই অস্বাভাবিক ও বিকৃত, সেই বরং অসম্পূর্ণ স্ত্রীলোক। জনৈক বৈজ্ঞানিক তাই বলেছেন যে বলতে গেলে পুরুষ হয়ে জন্মানোই এক ব্যাধি।

আমাদের দেবতারা কিন্তু যে উপাদানে নারীকে সৃষ্টি করেছিলেন তা দেখলে মনে হয় এত মনোযোগে ও কৌশলে যে গঠিত সে কখনো কারো ছোট হতে পারে না। ব্রহ্মার ফর্মুলাটা নাকি ছিল এই রকম : গাছের পাতার লঘুতা, হরিণীর দৃষ্টি, সূর্যরশ্মির ফুর্তি, কুয়াশার অশ্রু ; হাওয়ার খেয়াল আর খরগোশের ভীরুতা ; ময়ূরের গর্ব আর সারস কণ্ঠ-পালকের কোমলতা ; হীরকের কাঠিন্য, মধুর স্বাদ, বাঘের হিংসা, আগুনের তাপ আর তুষারের হিম ; চড়াইয়ের কিচির-মিচির আর ঘুঘুর ডাক ; এগুলি গলিয়ে একসঙ্গে মেশালে—নারী।

ভদ্র ও অভদ্র

স্ত্রী পুরুষের মধ্যে যেই বড় হক এটা ঠিক যে একজনকে ছাড়া অন্যের চলে না। এবং এই দুইয়ের যোগে সৃষ্টি হয় যে আশ্চর্য বস্তু প্রেম তার মত শক্তি জগতে আর বোধহয় নেই। অস্কার ওআইল্ড ফাজলামি করে বলেছেন, "প্রেম জিনিসটার সবচেয়ে বড় দোষ এই যে শেষ হয়ে গেলে বড় বৈরাগ্য এসে যায় প্রেমের প্রতি।" অথবা, "নারীর সঙ্গে পুরুষ নিশ্চয় সুখী হতে পারে—যতক্ষণ তাকে সে ভাল না বাসে।" কিন্তু প্রেম কাল্পনিক বা ক্ষণিক যাই হক, ব্যক্তি বা সমষ্টির ইতিহাসে তার স্থান যে অতিশয় বড় তা কেউ অস্বীকার করতে পারে না। "ক্লিওপ্যাট্রার নাক," বলেছেন দার্শনিক পাস্কাল, "যদি হত আর একটু ছোট তাহলে পৃথিবীর চেহারা বদলে যেত।" হেলেন, সীতা ইত্যাদিও ইতিহাস সৃষ্টি করে গেছে। তাদের নিকৃষ্টতর ভগ্নীরা গৃহে গৃহে ক্ষুদ্র ইতিহাস তৈরি করে।

প্রকৃতি এখানেও পুরুষ মানুষকে মেরেছে নির্দয় ভাবে—যদিও পশুপাখিদের মধ্যে পুরুষরাই সাধারণত পেয়েছে তার করুণা। সিংহের আছে কেশর, হরিণের শিং, ময়ূরের পেখম—আঙ্গিক সৌন্দর্যে তারা স্ত্রীকে মুগ্ধ ও বশ করেছে। মানুষের বেলায় উল্টো নিয়ম, স্ত্রী মন ভোলায় আর পুরুষ দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছোটে। অবশ্য সম্প্রতি কোনো কোনো সাহিত্যিক নাকি আবিষ্কার করেছেন যে ওটা চোখের ভুল মাত্র, আসলে মেয়েই পুরুষকে ধাওয়া করে বেড়াচ্ছে, নির্বোধ পুরুষ এত হাজার বছর তা টেরই পায় নি।

তা যাই হক, মাত্র এই পর্যন্তই দেশে দেশে এক। এর বাইরে স্থান কাল পাত্র অনুসারে প্রেমের বিচিত্র গতি। এ দেশের বিশুদ্ধ

ভারতীয় মতে আত্মনিবেদন দেখতে হলে শহরে আর তা এখন সম্ভব নয়, সেখানে সব কিছুতেই পশ্চিমের ভেজাল। খাঁটি পাড়াগাঁয়ে হয়তো পাওয়া যাবে শরৎ চাটুজ্যের উপন্যাস পড়া নায়িকা যে ধুপ করে মাটিতে বসে পড়ে বলবে, "চরণে স্থান দাও"। আবার এই হৃদয়স্পর্শী গভীরতার বিপরীত চূড়ান্ত লঘুতা আছে মার্কিন প্রেম নিবেদনে। সে দেশের আধুনিক তরুণ হয়তো রবার চিবোতে চিবোতে বলবে, "Say, how about some smooching, baby ?" ঐ ভয়ংকর শব্দটা ইংরেজী ভাষায় আমেরিকার নিজস্ব দান,—necking, petting ইত্যাদি শব্দে ঠিক ঐ অর্থ হয় না। এসব সূক্ষ্ম তারতম্য ওদের দরকার, কারণ ও দেশে প্রেম জিনিসটা অল্প-বয়স্কদের মধ্যে আজ প্রায় এক outdoor game হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভাল করে কথা বলতে শেখার আগেই প্রায় ছেলেমেয়েদের গার্লফ্রেণ্ড ও বয়ফ্রেণ্ড দরকার হয়ে পড়ে। তা না থাকা তোতলামি বা দারিদ্র্য বা ঐ রকম কোনো দুর্ভাগ্যের মতই লজ্জাকর। বাপ মায়েরাও এতে বিব্রত হয়ে পড়েন, সেজন্য তারা বেস্‌বল খেলা বা সাইকেল চড়ার মত এতেও সন্তানদের উৎসাহ দেন। তাছাড়া এই সেদিন ডক্টর কিন্‌সি বলেছেন যে শিশুদের যৌন শিক্ষা আরম্ভ হওয়া উচিত দশ বছর বয়স থেকে।

আমেরিকানের দৈনন্দিন জীবনে দুটি মাত্র জিনিস—কাজ আর মজা ('having fun')। মজার জন্য টাকার দরকার, সুতরাং কাজ না করে উপায় নেই। কিন্তু সেটা চুকিয়ে দিয়ে ওরা আর সময় নষ্ট করে না, বান্ধবীর সঙ্গে বাকি জাগ্রত মুহূর্তগুলি উপভোগ করে খেলা, সিনেমা, নাচ বা রেস্তরাঁয়। তা সত্ত্বেও তাদের দ্রুত, চঞ্চল জীবনে মাঝে মাঝে উত্তেজনা আরো দরকার হয়ে পড়ে। সেজন্যই প্রতি বছর দু চারটে নিগ্রোকে মেরে দিনগত বিরক্তি দূর করতে হয়—

আমরা যেমন মাঝে মাঝে ট্রাম পুড়িয়ে দোকান লুঠ করে একঘেয়ে জীবনে বৈচিত্র্য আনি।

আমেরিকানদের প্রণয় রীতি সম্প্রতি দু খণ্ড প্রামাণ্য বইতে অনেকখানি উন্মোচিত হয়েছে। কয়েক হাজার স্ত্রী পুরুষের সঙ্গে ব্যক্তিগত আলাপ করে ডক্টর কিন্‌সি ও তার সহকর্মীরা স্ত্রী ও পুরুষের যৌন আচরণ সম্বন্ধে লিখেছেন এই জ্ঞানভাণ্ডার। এর অনেক চমকপ্রদ তথ্যের মধ্যে একটা হল এই যে ও দেশে মেয়েদের প্রতি দুজনের একজন বিয়ের আগে যৌন অভিজ্ঞতা অর্জন করে, এবং শতকরা নব্বই জন শেষ পর্যন্ত না গেলেও পুরুষের স্পর্শ ও আদর উপভোগ করেছে। এখানে এও লক্ষ করার বিষয় যে এ ব্যাপারে কলেজের মেয়েরা বেশী আগুয়ান, কিন্তু ডিগ্রিধারী ছেলেরা অপেক্ষাকৃত অশিক্ষিত পুরুষের তুলনায় বেশী সনাতনপন্থী। এবং অনেক পরিবারের খবরাখবর বিচার করে ডক্টর কিন্‌সি সিদ্ধান্ত করেছেন যে আগে যৌন অভিজ্ঞতা থাকলে বিয়ের পরে সংসারযাত্রা মসৃণতর হয়।

বয়সের সঙ্গে স্ত্রী পুরুষের যৌন আবেগ কি ভাবে ওঠে ও নামে সে সম্বন্ধে তিনি যে তথ্য দাখিল করেছেন তাও নতুন করে অনেকের চোখ খুলেছে। তিরিশের পরেই নাকি পুরুষের ভাঁটা আরম্ভ হয় এবং দ্রুত নামতে থাকে, যদিও নারী তখন সবে শিখরে উঠছে এবং তার জোয়ার থাকে অন্তত পঞ্চাশ ষাট বছর বয়স পর্যন্ত, কখনো তারও ঊর্ধ্বে। সাধারণ ধারণার বিপরীত এই আবিষ্কার ওদের সমাজে নানারকম জটিলতার সৃষ্টি করেছে। যথা, স্বামীর সেক্রেটারির বয়স কত হবে তা নিয়ে স্ত্রীরা ভেবে কূল পাচ্ছেন না; বিজ্ঞান বলে ষোলর চেয়ে ষাট বেশী বিপজ্জনক, কিন্তু ষোড়শীর মসৃণ ত্বকের দিকে চেয়ে মন ঠিক তা মানতে চায় না।

এ বই পড়ে দমে যাবার কারণ স্বামীদেরও যথেষ্ট আছে। শুধু যে সহধর্মিণীর প্রাক্‌পরিণয় অভিজ্ঞতার কালো ছায়া শয়নে স্বপনে ঘুরঘুর করে আসে মনে তাই না, যৌন আবেগে স্ত্রীর তুলনায় পুরুষ প্রায় জন্তুর মতই প্রতিপন্ন হয়েছে। বস্তুত, ডক্টর কিন্‌সি যেসব স্ত্রীলোকের সঙ্গে কথা বলেছেন তাদের একজন জানিয়েছে যে পুরুষদের দেখলে তার মনে আসে লালসা-চঞ্চল রামছাগলের ছবি। পুরুষ সহজে উত্তেজিত হয় নারীদেহের ছবি দেখে, ঝাঁজালো বই পড়ে বা নাচঘরের দৃশ্যে, কিন্তু ওসব অশুদ্ধ আমিষ বস্তু নারীকে প্রায় স্পর্শই করে না। বরং কাব্যিক প্রেমের কাহিনী, বইয়ে বা চলচ্চিত্রে, কিছুটা জাগায় তার আকাঙ্ক্ষা, কিন্তু সাধারণত তার আবেগ আসে নিজের খেয়ালে এবং নিভেও যায় অতি সামান্য কারণে—হয়তো ধোবার হিসেবের কথা হঠাৎ মনে পড়ায় অথবা রাস্তার কোনো গাড়ির শব্দে।

ডক্টর কিন্‌সি তার বইয়ের যা নাম দিয়েছেন তাতে মনে হতে পারে যে তার তথ্য সমগ্র মানব-জাতির প্রতি প্রযোজ্য, কিন্তু যেটুকু পরিচয় দেওয়া হল তা থেকেই বোঝা যাবে যে অমার্কিন সমাজে এর অনেকাংশই খাটে না। বিবাহ-বহির্ভূত যৌন অভিজ্ঞতায় কেউ কেউ যেমন ওদের অনেক নিচে, আবার অনেক জাত হয়তো ওদের ছাড়িয়েও যেতে পারে।

বলা বাহুল্য রুশদেশে প্রণয়ের আদর্শ আমেরিকার সম্পূর্ণ বিপরীত। ও দেশটা আমার দেখা হয় নি, তবে চলচ্চিত্র ও বই থেকে মনে হয় যে প্রেম বস্তুটাকে ওরা মোটেই খেলা বলে মনে করে না, যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে থাকে—এমন কি বিষয়টা বোধহয় ওদের পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনারও অন্তর্গত। ইস্পাত কারখানার কর্মী প্রিয়াকে যদি বলে "আমি তোমায় আমাদের ব্লাস্ট্ ফার্নেসের মতই ভালবাসি",

সে হয়তো জবাব দেবে "আর তোমাকে দেখলে আমাদের কালেক্‌টিভ ফার্মের নতুন হেভি ট্র্যাক্টার দেখার মত শিহরণ হয়"। কিছু কাল আগে কাগজে দেখা গিয়েছিল বর্মাতে না কোথায় যেন কমিউনিস্ট পার্টি সভ্যদের জন্য পূর্বরাগের নিয়ম বেঁধে দিয়েছে—প্রেমিক ও প্রেমিকা পরস্পরকে কি বলবে, কি কথার কি জবাব হবে. ইত্যাদি। সাধারণের সুখসুবিধার যেখানে প্রশ্ন সেখানে কোনো খুঁটিনাটিই যে কমিউনিস্টদের দৃষ্টি এড়ায় না এ তার আরেকটি দৃষ্টান্ত।

ভাষার থেকেও বৈচিত্র্যের উৎপত্তি দেশবিদেশের প্রণয়ে। ঐ একটা শব্দ সব ভাষাতেই এত কাজ করে যা আর কোনো শব্দকে বোধহয় করতে হয় না। ইংরেজী love শব্দটা সম্পূর্ণ দৈহিক থেকে সম্পূর্ণ বায়বীয় প্রেম বোঝাতে পারে, আবার গাছপালা, আকাশ বাতাস, রোস্ট্‌ বীফ থেকে আরম্ভ করে কুকুর বেড়াল, মানুষ ও ঈশ্বরে পর্যন্ত তা প্রযোজ্য। ওদের তবু like বলে একটা কথা আছে, কিন্তু প্রেমিকের মক্কা ফরাসীদেশে একটি ক্রিয়াপদ দিয়েই সব কাজ সারতে হয়। ফরাসী ললনা যদি বলে je vous aime তবে সঙ্গে সঙ্গে যে তাকে বাহুবদ্ধ করতে হবে এমন কোনো কথা নেই। ঐ ভাষায় অবশ্য শুষ্ক শব্দের চেয়ে সুরের দরদ ও অঙ্গভঙ্গির তাৎপর্য বেশী; সুতরাং ফরাসী যুবকের হয়তো বুঝতে কোনো অসুবিধা হবে না, কিন্তু বিদেশীর পক্ষে বিপদের আশঙ্কা আছে।

প্রণয়ের ক্ষেত্রে নীতি ও আবরুর আদর্শ অবশ্য পশ্চিমে অনেক বিভিন্ন প্রাচ্যের থেকে—ওদের যেখানে শ্লীলতা হানি হয় আমাদের হয় তার অনেক আগে। পশ্চিমের মেয়েদের পোশাকেই এর দৃষ্টান্ত। 'বিকিনি' সাঁতার-জামা দেখে সন্দেহ হয় যে আসলে তা জামা নয়, দেহের দু জায়গায় আঘাতের ফলে যেন ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হয়েছে। গাউনের বক্ষরেখা ক্রমশ এত নিচে নামছে যে আর দু চার

বছরের মধ্যে হাঁটু দেখা যাবে মনে হয়। তবে সে ভয় (*বা আশা*) বোধহয় নেই কারণ কি এক জোয়ার ভাঁটার নিয়মে পাশ্চাত্য ললনার বক্ষরেখা ও জানুরেখা দু এক বছর পর পর ওঠানামা করে—যেমন কিছুদিন আগে 'নিউ লুক' নাম দিয়ে হঠাৎ স্কার্ট নেমে পড়েছিল ইঞ্চি কয়েক। এসবের বিধানদাতা অবশ্য প্যারিসের মুষ্টিমেয় কয়েকটি ডিজাইনার ; এঁদের আশ্চর্য ক্ষমতার ভয়ে য়োরোপ আমেরিকার স্বামীরা সর্বদা জুজু, কারণ মুখের এক বাণীতে এরা টাকার থলি খালি করে দিতে পারে। এই ফ্যাশান শাস্ত্রকারদের লাভের ব্যাবসা অবশ্য একদিনও টিঁকত না যদি যেসব মেয়েদের (অর্থাৎ স্বামীর বা বাবার) পয়সা আছে তারা দু বছরের পুরনো জামা পরতে লজ্জায় মরে না যেত। তাই বক্ষরেখাকেও ওঠানামা করতে হয়।

আজকের নতুন ভারত যেমন অনেক বিষয়ে পশ্চিমকে পিছনে ফেলে যাচ্ছে তেমনি এক্ষেত্রেও আমাদের আধুনিকারা এক নতুন পথ দেখিয়েছেন পেটকাটা জামায়। একসঙ্গে বক্ষরেখা নামিয়ে ও উদর-রেখা তুলে এরা সাঁড়াশি কৌশল (pincer movement) প্রয়োগ করে অন্ধকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়েছেন।

আর একটা বিষয়েও আমরা পশ্চিমের অনেক দেশের থেকে বেশী আগুয়ান। জন্ম-নিয়ন্ত্রণের সরঞ্জাম কলকাতার পথে বিক্রি হয়, কিন্তু য়োরোপে ইটালি প্রমুখ অনেক ক্যাথলিক দেশে তার বিক্রি নিষিদ্ধ। লণ্ডনের ডাক্তারী দোকানে তা প্রকাশ্যে রাখা চলে, কিন্তু নিউ ইয়র্কে অলক্ষ্যে।

শ্লীলতার মান আসলে পশ্চিমের দেশে দেশে বেশ বিভিন্ন। আমরা হলিউডের ছবি দেখে বা কিন্‌সি রিপোর্ট পড়ে ভাবতে পারি এখানেও বুঝি প্রগতির প্রথম পুরস্কারটা আমেরিকানরাই পেয়েছে, কিন্তু বস্তুত তা নয়। কিছুদিন আগে ইংলণ্ড ও আমেরিকার চলচ্চিত্র

পরস্পরের দেশে দেখানো নিয়ে এক সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল। আমেরিকার সেন্‌সর বলে বিলেতের বক্ষরেখা বড় নিচু, আবার বিলেতী মাপ্‌কাঠিতে মার্কিন জানুরেখা বেশী উঁচু। ফরাসীরা অবশ্য দু দেশের ছবিই আনায়াসে গ্রহণ করবে এবং তাও হয়তো বেশ জোলো ঠেকবে ওদের চোখে। ত।'দর এক ছবিতে দেখেছিলাম এক যুবক কল্পনা করতে চেষ্টা করছে একটি মহিলার গায়ের জামাকাপড়-গুলি না থাকলে তাকে কেমন দেখাত; ফরাসী 'বাস্তববাদের' ফলে সেই কাল্পনিক দৃশ্য দর্শকের চোখের সামনে ভেসে উঠল। শিশুকে স্তন্যদান ইত্যাদি অবশ্য ওদের ছবিতে খুবই সাধারণ।

আমার মনে হয় য়োরোপের প্রায় সব দেশেই চলচ্চিত্র এদিক থেকে ইংলণ্ড ও আমেরিকার চেয়ে বেশী আগুয়ান। চেকোস্লো-ভাকিয়ার বিখ্যাত এক ছবি Ekstase, চলচ্চিত্রের অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি এর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছে। এই ছবিতে হেডি লামার (তখন সে ছিল হেডি কাইজলার) হ্রদে স্নান করে অনেক দূরে দৌড়ে গেল যেখানে তার জামাকাপড় পড়ে আছে। ছবিতে সে ছিল এক বৃদ্ধের তরুণী ভার্যা, তার মনে নিষ্ফল যৌন প্রবৃত্তির দ্বন্দ্বই ছবির বিষয়বস্তু এবং তা প্রতিপন্ন করার জন্য এমন জিনিস ওরা দেখিয়েছে যা ইংরেজী ভাষার কোনো ছবিতে একেবারেই সম্ভব নয়। ফলে এ ছবি অনেকদিন আমেরিকার থেকে নির্বাসিত ছিল, পরে অনেক কাটাকাটি করে দেখানো হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে বর্তমানের চাঞ্চল্যকর আমেরিকান অভিনেত্রী মারিলিন মন্‌রোর নামও করা যেতে পারে। 'যৌন আবেদনে' বোধহয় সেই এখন ও দেশে প্রথম। কিন্তু বছর কয়েক আগে যখন তার আজকের খ্যাতি ছিল না, যখন সে ফটোগ্রাফারের মডেল ছিল তখন তার এক বিবস্ত্র ছবি ক্যালেণ্ডারে ব্যবহার করা হয়। অখ্যাতির দিনে যে ছবি

ঘরের দেয়ালে থাকতে কোনো বাধা ছিল না সেই ছবিই তাড়াতাড়ি-নিষিদ্ধ হল সবাই তাকে চেনার পরে। মনে হয় ফরাসীদেশে হলে ঐ ছবির প্রচার বরং আরো বেড়ে যেত। যে দেশে জাতির মস্ত গর্বের বস্তু Folies Bergères রঙ্গমঞ্চ যেখানে সম্ভ্রান্ত মন্ত্রীরা পর্যন্ত রাষ্ট্রের সম্মানিত অতিথিদের এনে আতিথ্য করে থাকেন, সে দেশে মাত্র ছবির নগ্নতায় সরমে মরে যাবার কারণ নেই কোনো নটীর।

যৌন আবেদন বিকশিত করা ছাড়াও যে পোশাকের অন্য কাজ আছে তা ভুলতে পারলেই বোধহয় আধুনিকারা খুশী হয়, কিন্তু সব দেশে তা সম্ভব না। ইংলণ্ডে শীত গ্রীষ্মের ভেদাভেদ অপেক্ষাকৃত কম বলে ইংরেজ ললনাদের ফুরফুরে জামা পরা সারাবছরে প্রায় হয়েই ওঠে না। সেখানে যৌন আবেদন বিকাশের লোভ থেকে নিউমোনিয়ার ভয়টা বেশী প্রবল। ইংরেজের তথাকথিত যৌন শৈত্য আজ প্রায় বিশ্বের প্রবাদবাক্য, সেটাও হয়তো আবহাওয়ারই ফলে। ফরাসীদেশে বা মধ্য য়োরোপের অন্যত্র প্রকাশ্যে জড়াজড়ি কামড়া-কামড়ি পথে ঘাটে চোখে পড়ে, কিন্তু সেই স্বাধীনতার প্রতি ইংলণ্ড ও আমেরিকার নীতি ভ্রূকুটি করে। ডেনমার্কের মেয়েরা প্রেমের খেলায় প্রায় পুরুষের সমানই অগ্রসর এবং সেটা ওদের চোখে মোটেই খারাপ দেখায় না।

আমরা অবশ্য এই সব উন্নত আদর্শের এখনো অনেক নিচে, তবে গত দুই পুরুষের মধ্যে যে পরিবর্তন হয়েছে তাও নেহাত সামান্য নয়। আমার পরিচিত এক বৃদ্ধা আধুনিক সমাজের বেহায়াপনা দেখে দুঃখ করে বলেছিলেন যে তাদের দিনে তিন চারটে সন্তান হবার আগে স্ত্রীরা স্বামীর সঙ্গে কথা বলাই আরম্ভ করত না। কথাটা আমার খব মনে লেগেছিল, কারণ এই দৃষ্টান্তে আধুনিক

যুগের নির্লজ্জ স্বভাব তো প্রতীয়মান হয়ই, এও বোঝা যায় যে পূর্বপুরুষদের তুলনায় আমরা 'কাজের লোক' থেকে আজ কতখানি 'কথার লোক' হয়ে পড়েছি।

পশ্চিমের লোকের চোখে আমাদের পোশাকের স্বল্পতা, আমাদের খোলা গা খারাপ ঠেকে, যদিও এ দেশে এই আবরুহীনতার কারণ কিছুটা আবহাওয়া কিছুটা দারিদ্র্য। কিন্তু আমেরিকার ওয়াই. এম. সি. এ.তে যখন দেখি স্নানঘরে সম্পূর্ণ নিরাবরণ বারোয়ারী ব্যবস্থা তখন তার সে রকম কোনো কারণ পাওয়া যায় না। এমন কি যেখানে ঘরে ঘরে টেলিফোন, যে বাড়িতে এক পা কেউ সিঁড়ি ভেঙে ওঠে না, সেখানেও পায়খানার সামনে একটা দরজা বসানো তারা বাজে খরচ বলে মনে করেছে (যার ফলে খবর-কাগজ পড়ার কাজটা সবাই ওখানে বসে সারে)।

বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেল্‌স শহরের পথে পথে এক প্রস্রাবরত বালকের মূর্তি দেখা যায়। প্রবাদ বলে শহরের প্রাচীনতম নাগরিক সে, তাকে ওরা এই ভাবে সম্মানিত করেছে। অবশ্য এতে ফোয়ারার কাজও হয়, অনেকে আসে জল খেতে, এবং ঐ মূর্তির ছোট বড় প্রতিকৃতি পর্যটকদের বেচে কিছু পয়সাও হয়।

মানুষের গর্ব যে সে জেনেছে দেহাতীত, অতীন্দ্রিয় প্রেম। প্রকৃতির মনে এই কথা ছিল বলে কিন্তু প্রাণীজগতের অন্যত্র বিশেষ কিছু সমর্থন পাওয়া যায় না। সৃষ্টি যেন চলেছে দেহের গ্রন্থিরস বা হর্মোনের তাড়নায়। এই তাড়না মানুষকে অস্থির করে সারা বছর, কিন্তু তথাকথিত ইতর প্রাণীদের মাত্র বিশেষ দিনে বা ঋতুতে। আমাদের তুলনায় এতখানি সভ্য হয়েও কিন্তু শেষপর্যন্ত তারা প্রবৃত্তির দাস—যদিও ইতর প্রাণীর ব্যবহারে অনেক সময়ই আমরা

প্রেমের লক্ষণ দেখে থাকি। কোনো কোনো মাকড়সার প্রণয়ের মত ভয়ংকর জিনিস জগতে আর দুটো নেই; সেখানে পুরুষ স্ত্রীর কাছে আসে দুরু দুরু বুকে কারণ তার ভাগ্য সম্পূর্ণ নির্ভর করে স্ত্রীর মেজাজের উপর—হয় প্রেম নিবেদন নয়তো মুণ্ড বিসর্জন। প্রেম নিবেদনের পরেও তাড়াতাড়ি পালাতে না পারলে অনেক সময় স্ত্রীর পেটে যেতে হয়। দেখে মনে হয় কিপলিং যে বলেছেন The female of the species is more deadly than the male তা শুধু মানুষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়। মাকড়সা অবশ্য অত্যন্ত হীন প্রাণী, কিন্তু মানুষ ছাড়া আর প্রায় কোনো জীবই সাধারণত দু বছর এক স্ত্রীর সঙ্গে ঘর করে না। পাখির গানকে অনেকে পূর্বরাগের সঙ্গে যুক্ত করেছে—এবং গান যে স্বর্গীয় বস্তু তা কে না জানে—কিন্তু ইতিমধ্যে ব্যস্তবাগীশ কোন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করে বসে আছে যে ঐ গান প্রিয়ার কানের উদ্দেশ্যে মোটেই নয়, বরং অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বী পুরুষদের লক্ষ করে; তা মধু ঝরায় না, শুধু ধমক দেয় দূরে সরে পড়ার জন্য।

সন্তানপ্রেম সম্বন্ধেও আমাদের অনুরূপ ধারণা আছে। পাখি এত যত্নে তার ডিমে তা দেয় দেখে আমরা নিজেদের প্রতি লজ্জায় মাথা হেঁট করি, কিন্তু আসলে ঐ সময় পাখির বুকে কতগুলি চুলকানি গজায় বলে মসৃণ শীতল ডিমের গায়ে তা ঠেকিয়ে রাখতে ভাল লাগে। বলা বাহুল্য, বংশরক্ষার উদ্দেশ্যে এ প্রকৃতির এক ফন্দি, সন্তানপ্রেম নেই এর মধ্যে। ডিম সরিয়ে নিয়ে চীনামাটির বল রাখলেও পাখি সমান যত্নে তা দেবে। অনেক জন্তু যে নিজের সন্তানকেই খায় তা অনেকেই দেখেছে।

কিন্তু মানুষ বুদ্ধি ও বিচারে মাকড়সা, পাখি এমন কি বানরেরও অনেক ঊর্ধ্বে; সে সৃষ্টি করেছে দর্শন, শিল্প, বিজ্ঞান। সেজন্যই তো

মনে হয় বিশেষের প্রতি প্রেম এবং অতীন্দ্রিয় প্রেম হয়তো তার ঐ শ্রেণীর এক আশ্চর্য সৃষ্টি বা উদ্ভাবনা মাত্র। যে প্রতিভাবান পূর্বপুরুষ কোন পুরাকালে এই জিনিসটি উদ্ভাবন করেছিলেন তার দান আগুন, কৃষি বা গাড়ির চাকা সৃষ্টির চেয়ে কিছু কম নয়।

সেই স্মরণীয় দিন থেকে আরম্ভ করে যুগে যুগে কত কবি মানুষের নিজস্ব এই অতীন্দ্রিয় প্রেমের জয়গান গেয়ে গেছেন। ফলে এখন প্রেমে পড়া আমাদের খুব সহজ হয়ে গেছে। এক প্রসিদ্ধ ফরাসী বাক্যবিশারদ বলেছেন, "এমন লোক কত আছে যারা কোনোদিন প্রেমে পড়ত না যদি প্রেমের কথা আগে না শুনত!" বর্তমান যুগের পকেট বুক, সস্তা রেডিও এবং সর্বোপরি চলচ্চিত্রের সাহায্যে দিন দিন প্রেম আরো সহজ থেকে সহজতর হবে সন্দেহ নেই।

ভালবাসি আর ভালবাসি বলে মনে করি এর মধ্যে পার্থক্য ধরতে পারেন কোন দেবতা, জিজ্ঞাসা করেছেন আঁদ্রে জিদ। কিন্তু হক না প্রেম কাল্পনিক, তবু তাতে আমাদের প্রয়োজন আছে। ঈশ্বর না থাকলেও যেমন তাকে বানিয়ে নিতে হত, প্রেম আমাদের তেমনি সৃষ্টি। নতুবা যে বিচারবুদ্ধি ও সৌন্দর্যবোধ নিয়ে আমরা জন্মেছি তাই হত আমাদের কাল, নিছক জীবনধারণের বিরক্তিতে আমরা মরে যেতাম। আর যাদের হাইড্রোজেন বোমা বানাবার মত বুদ্ধি বা 'মেঘদূত' লিখবার মত সৌন্দর্যজ্ঞান নেই, যারা বিরক্ত হতে জানে না, সেই নির্বোধ ইতর প্রাণীরাই পৃথিবীতে রাজত্ব করত।

রাজার পোশাক

ইংরেজী love শব্দটার মত culture কথাটারও বিভিন্ন অর্থ আছে। অস্কার ওআইল্ড আমেরিকা ঘুরে আসার পর মার্কিন কালচার সম্বন্ধে তাকে প্রশ্ন করা হয়। উত্তরে তিনি একটি ঘটনার উল্লেখ করে এর দৃষ্টান্ত দিয়েছিলেন। এক বিত্তশালী আমেরিকান একদা ভেনাস দ মিলোর এক মূর্তি অর্ডার দিয়েছিল। মূর্তি যখন তার কাছে এসে পৌঁছাল তখন দেখা গেল তার হাত ভাঙা। ফলে ভীষণ দুঃখে ও রাগে ভদ্রলোক রেল কোম্পানির কাছে ক্ষতিপূরণ দাবি করলেন।

এখন অনেকে হয়তো বলবে এই লোকটির কালচার নেই। অপর পক্ষে যারা দৈনন্দিন জীবনে তাকে জানে, যারা তার সঙ্গে একত্রে ডিনার খেয়েছে ও সামাজিক সংস্পর্শে এসে তার নিখুঁত রীতিসম্মত ব্যবহারে মুগ্ধ হয়েছে তাদের চোখে হয়তো সে কৃষ্টির আদর্শ বলেই মান্য। যে ব্যক্তি খবর-কাগজ ছাড়া আর কিছু পড়ে না, শিল্প বা দর্শনের সঙ্গে যার মুখ-চেনা আলাপও নেই, বিজ্ঞান সম্বন্ধে যার কৌতূহল নগণ্য, তার পোশাক যদি পরিপাটি, বাক্য যদি মিষ্ট, আতিথ্য যদি মসৃণ হয় তবে বোধহয় সব দেশেই অধিকাংশ লোকের দৃষ্টিতে সে সমাজের শিরোমণি।

কিন্তু সমাজে আরো কয়েক শ্রেণীর লোক পাওয়া যায় যাদের কৃষ্টি সম্বন্ধে ভিন্ন লোকের ভিন্ন মত। যে ব্যক্তির পেশাই প্রতারণা এবং মিথ্যা প্রতিজ্ঞায় কোনো দ্বিধা নেই অথচ যার নিখুঁত শিষ্টতার বা মধুমাখা কথার এক চুল এদিক ওদিক কখনো হয় না; যে পণ্ডিত দার্শনিক মাঝে মাঝে স্ত্রীকে প্রহার করেন অথবা যে বিশ্ববিখ্যাত শিল্পী আত্মগর্বে আর কাউকে চোখেই দেখেন না; এমন কি আমাদের

প্রতিবেশী গাড়ির মালিক যে ভদ্রলোক ট্রামে চড়াকে অত্যন্ত আড়চোখে দেখেন, যদিও মুখের কথায় সবিনয়ে ঘোষণা করেন যে ট্রামে চড়লে মোটেই তার জাত যাবে না,—এরা সবাই কারো চোখে কালচারের অধিকারী, কারো চোখে নয়। নিজেকে বড় করে দেখানো বোধহয় মানুষের সবচেয়ে প্রবল সহজাত প্রবৃত্তি এবং এর ফলে সমাজের প্রতি স্তরে, প্রতিনিয়ত দৈনন্দিন ব্যবহারে ও বাক্যে যে বিচিত্র আত্মশ্লাঘী ভানের উদ্ভব হয়ে থাকে তাই কি কৃষ্টির নিদর্শন —নাকি যারা অন্যকে কেবলই কালচারের খোঁটা দেয় তাদেরই আছে ঐ জিনিস ?

এই তর্কের মীমাংসা আমার উদ্দেশ্যে নয়। কালচার বলতে এখানে আলোচ্য মানুষের মননশীলতা ও সৌন্দর্যবোধ যা সৃষ্টি করেছে যুগে যুগে, বিভিন্ন জাতি যা নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের গর্বে আঁকড়ে আছে। সাহিত্যে যেমন ইংলণ্ড ও ফ্রান্স, সংগীতে ইটালি ও জার্মেনি, নৃত্যে রুশ, চিত্রে ফ্রান্স ও ইটালি প্রধানত নিজ নিজ ঐতিহ্য গড়ে তুলেছে। আমেরিকার নামটা বাদ দেওয়া হয়তো ঠিক হবে না, কারণ কয়েক দিকে যে সেও মৌলিকতা দেখিয়েছে তা অস্বীকার করা যায় না; সংগীতে jazz, নৃত্যে বুগি উগি, চিত্রে কমিক ও সাহিত্যে রিডার্স ডাইজেস্ট আমেরিকার নিজস্ব দান।

এদের তুলনায় প্রাচ্য এতকাল অন্ধকারাচ্ছন্ন ঘুমে 'প্রাচীন সভ্যতা'র স্বপ্নে এতখানি মগ্ন হয়ে ছিল যে বর্তমান কোথা দিয়ে গেল তা টের পায় নি, কিন্তু এবার আমরাও জাগতে আরম্ভ করেছি। জেগে আমরা স্বপ্ন ছেড়ে গর্ব ধরেছি। মাটির তলা থেকে পুরাতনের অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি সব খুঁজে খুঁজে বার করে তাকে আবার জোড়া লাগাতে আমরা এখন ব্যস্ত। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস সেই গলিত শবদেহের মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করার অলৌকিক শক্তিও আমাদের

আছে। জাতির কর্ণধাররা ইতিমধ্যেই ভাষা আর সংগীতে ভবিষ্যৎ প্রগতির সংকীর্ণ পথটা ছকে দিয়েছেন ও বিদেশী আগাছা সমূলে ধ্বংস করার মহৎ আদর্শে প্রতিদিন আমাদের উদ্বুদ্ধ করছেন। এই শুচিবাই এমন পেয়ে বসেছে আমাদের যে ইতিহাসের শিক্ষার প্রতি কর্ণপাতেরও অবসর নেই।

প্রথম সৃষ্টিতে মানুষের ছিল কয়েকটি বিশুদ্ধ জাতি (race)। ক্রমে তার সামাজিক ও যাযাবর প্রবৃত্তির ফলে ঘটল সংমিশ্রণ, জাতি ভেঙে হল প্রজাতি। এই আদান-প্রদান ও সংমিশ্রণ সভ্যতার বিস্তারের সঙ্গে ক্রমশ বেড়েই যায়, কখনো কমে না ; সেই কারণে 'বিশুদ্ধ জাতি'র শেষ মানুষটি বহুদিন আগেই লোপ পেয়েছে। তবু যদি কেউ চায় তার যুগযুগান্ত আগের কোনো খাঁটি পূর্ব-পুরুষের বিশুদ্ধ রক্ত দেহে ফিরে পেতে তবে সেটা যেমন অসম্ভব, কালচারের শুদ্ধিও তেমনি অদ্ভুত ব্যাপার। তার চেয়েও বড় কথা হল যে এ চেষ্টা অনাবশ্যক। জীববিজ্ঞান বলে রক্তের সংমিশ্রণে মানুষের উপকারই হয়েছে। ভাষা বা কালচারও সেই রকম আন্তর্জাতিক ও আন্তর্দেশিক ভাবের আদান প্রদানে ও সংযোগে স্বতঃই গড়ে ওঠে, তাকে রোধ করতে চেষ্টা করা অস্বাভাবিক।

আমাদের কর্ণধাররা কিন্তু দুটি নীতিকে গ্রহণ করেছেন আর সব কিছু অগ্রাহ্য করে। প্রথম, আমাদের যা কিছু পুরনো তাকেই বাঁচিয়ে তুলতে হবে, কারণ তা আমাদের নিজস্ব এবং পুরনো জিনিস মাত্রেরই দাম আছে। দ্বিতীয়, বিদেশী গন্ধ যার গায়ে আছে তাকে বর্জন করতে হবে কারণ তা ভাল হলেও আমাদের নয়।

তাই এ দেশের রাজনৈতিক নেতারা আজ মনে করছেন যে তথাকথিত উচ্চাঙ্গ সংগীত ছাড়া আর সব সুর নির্বাসিত না করলে, হিন্দি অক্ষরের মাত্রাটুকু বিসর্জন দিলে, মেয়েরা কালো পাড়ের

সাদা শাড়ি ছাড়া অন্য কিছু পরে কাজে এলে জাতীয় সংস্কৃতি ধূলিসাৎ হবে। নাৎসি জার্মেনির রাজনৈতিক পণ্ডিতরাও ঐ রাস্তায় নতুন জাতি গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। সোভিয়েট বিজ্ঞান, সাহিত্য, সংগীত নাকি আজ রাজনীতির আদর্শে অনুপ্রাণিত। কি বিষয়ে কাব্য রচনা করা চলবে, ইতিহাসের কোন ঘটনার কি অর্থ হবে, প্রাণীজগতে উত্তরাধিকারের কি নিয়ম এসব নাকি নির্দিষ্ট মন্ত্রীর দপ্তর থেকে বলে দেওয়া হয়। ফলে সে দেশের বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকরাও এই বলে তাদের তথ্যভারাক্রান্ত প্রবন্ধ শেষ করেন যে স্টালিনের মত বড় বৈজ্ঞানিক আজ পর্যন্ত আর জন্মায় নি।

আর এক শ্রেণীর অত্যাচার সরকারী বা বেসরকারী মূর্তিতে সব দেশেই মাঝে মাঝে দেখা দেয়, বিশেষ করে সাহিত্যে। তা হল বাস্তববাদ বা সমাজ-সংস্কারের খাতিরে তথাকথিত উদ্দেশ্যমূলক আর্ট। আমাদের দেশ নানাবিধ দুঃখ দুর্দশায় সর্বদা ভোগে বলে এই ধরণের 'ফলিত কলা'র তা আরো প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র। সিনেমায় রঙ্গমঞ্চে উপন্যাসে কাব্যে ক্রমাগত কেরানীর জীবনের ছবি এঁকেই এই শিল্পীরা আর্ট সৃষ্টি করেন, যেন কেরানীর দুঃখ আজো কারো অজানা আছে। দেশে দুর্ভিক্ষ, বন্যা বা ভূমিকম্প ঘটলে এরা শকুনির মত এসে পড়েন দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে, পড়ি কি মরি করে চলে অন্যের আগে বই লিখে ফেলার প্রতিযোগিতা। বই হয় এমন পুঙ্খানুপুঙ্খ 'বাস্তব' চিত্র যে তাকে ফটোগ্রাফ বললেই চলে। তুলির ছবির তুলনায় ফটোগ্রাফ যেমন আর্ট এই লেখারও ততটুকুই দাম।

আজ পৃথিবীতে যাদের সৃষ্টি টিঁকে আছে তাদের প্রত্যেকের কাছেই ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বা স্বভাব-আনুগত্য ছিল নিশ্বাসের মত সহজ। সব রকম 'বাদ' সর্বদা বাদ পড়েছে তাদের চিন্তার থেকে। আর্ট যে তার নিজেরই জন্য ছাড়া আর কিছুর জন্য হতে পারে এই

নির্বোধ তর্ক তাদের মনে কখনো আসে নি। যাদের আসে তাদের অবিনশ্বর সৃষ্টির সম্ভাবনা তখনি দম আটকে মরে।

শিল্পের সৃষ্টি যেমন রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক কারণে ব্যাহত হয়, শিল্পের উপলব্ধিও তেমনি স্বাধীন বা সহজ নয় আমাদের পক্ষে। এ বিষয়ে সবচেয়ে বড় বাধা হল পণ্ডিতদের সবজান্তা মন্তব্য। যে ছবি অন্যের প্রশংসায় আজ প্রসিদ্ধ তা দেখে গদগদ হওয়া ছাড়া অন্য কোনো ভাব দেখাতেও আমাদের ভয় করে। ইতিহাসবিশ্রুত পুণ্য বই পড়তে পড়তে যদি চোখ ঢুলে আসে তবে আত্মধিক্কারে জর্জরিত হয় সব ভাল লোক। রাজার পোশাক যদি এত সূক্ষ্ম হয় যে তা আমাদের স্থূল দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না তাহলে নিশ্চয় আমরা নির্বোধ বালকের মত চীৎকার করব না যে রাজা উলঙ্গ, বরং নিজের অন্ধতায় লজ্জায় মাথা হেঁট করে থাকব কিংবা আর সকলের হাততালিতে যোগ দেব।

আমিও তাই শুধু এটুকু বলে ক্ষান্ত হব যে আমাকে যদি জগতের একশোটি সেরা বইয়ের নাম করতে বলা হয় তবে সাধারণত এ ধরণের তালিকায় যেসব নাম থাকে তার সঙ্গে পঁচিশটাও মিলবে না। এবং এই বাতিলদের দলে এমন সব নাম আছে যা প্রকাশ করলে অবিলম্বে ফাঁসির হুকুম হতে পারে আমার। সুতরাং এ প্রসঙ্গ আর বাড়াব না।

এখনো প্রতি বছরেই বিশ্বের তিরোহিত প্রতিভাদের সম্বন্ধে গাদা গাদা জীবনী বা সমালোচনার বই প্রকাশিত হয়। রচয়িতার ভূমিকা পড়লে অবশ্য একেবারেই সন্দেহ থাকে না যে একমাত্র শিল্পের মর্যাদা বা ঐতিহাসিক সত্যের খাতিরেই সে এই পরিশ্রমের কাজে হাত দিয়েছে। পাতার পর পাতা সে পরম উৎসাহে প্রমাণ করে (অন্তত নিজের কাছে) যে যদিও এ সম্বন্ধে এ যাবৎ আরো উনিশখানা বই প্রকাশিত হয়েছে (তালিকা দ্রষ্টব্য বইয়ের শেষে), গভীর গবেষণার পর সে এই

সত্য আবিষ্কার করেছে যে তাদের সবগুলিই ভুল অথবা মিথ্যা উক্তিতে কণ্টকিত। তার চেয়েও বড় দোষ অসম্পূর্ণতা, এর আগে কোনো জীবনীকারই ঐ লেখকের বা শিল্পীর সব ব্যক্তিগত খুঁটিনাটি জানতে পারেন নি। যথা, এ তথ্য এ যাবৎ অনাবিষ্কৃত ছিল যে শেক্‌সপিয়ার মাছ পছন্দ করতেন না—এবং সেজন্যই ওফেলিয়া কেন অন্য কোনো উপায়ে না মরে জলে ডুবে মরল তার সন্তোষজনক কারণ এতদিন পাওয়া যায় নি ; এখন অবশ্য তা জলের মতই পরিষ্কার হয়ে গেল।

অথবা অমুক বিখ্যাত শিল্পী তার অমুক বিখ্যাত চিত্রে হঠাৎ একটা ভেড়া কেন এঁকেছেন তার যে তিনটে ব্যাখ্যা এ পর্যন্ত অন্যেরা দিয়েছে তার কোনোটাই ঠিক খাটে না। কিন্তু সম্প্রতি 'গভীর গবেষণা ও অধ্যয়নের ফলে' লেখক এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে আসলে ঐ জন্তুটা হচ্ছে নিপীড়িত মূক জনগণের প্রতীক। এবং এতে এখন নিঃসন্দেহে প্রমাণ হচ্ছে যে জনসাধারণের প্রতি শিল্পীর গভীর দরদ ছিল, তাদের দুঃখই ছিল তার শিল্পের অনুপ্রেরণা, যদিও নিজের জীবনে তিনি তা অন্যভাবে কখনো প্রকাশ করেন নি। এই যুগান্তকারী আবিষ্কারের পর চিন্তাশীল ব্যক্তিদের আর এই ভেবে ঘুম নষ্ট করতে হবে না যে ঐ ছবিতে খোলা মাঠে গাছের তলায় হঠাৎ একটা ভেড়া কি করতে এসেছিল।

এই সব দৃষ্টান্তের নীতি হল অধ্যবসায়ের গুণ,—লেগে থাকলে মানুষের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়। তবে যাদের নিয়ে এত কাণ্ড সেই সব প্রতিভারা নিজেদের সম্বন্ধে এত নতুন তথ্য জেনে বহু দিনের কবরের তলায় কিঞ্চিৎ বিস্মিত হতে পারেন। তাদের অমুক সৃষ্টির যে আসলে এই অর্থ ছিল, তাদের ব্যক্তিগত চরিত্রে যে এত গুণ ছিল তা অন্যের কাছ থেকে জানতে হল বলে নিশ্চয় তারা লজ্জায় নতুন করে মরেন।

'মোনা লিসা' চিত্র সম্বন্ধে এই পাঁচশো বছরে গাদা গাদা অনুশীলন-ভারাক্রান্ত বই ও সন্দর্ভ লেখা হয়েছে ও আজও হচ্ছে। ঐ সূক্ষ্ম হাসির মধ্যে নাকি শুধ্ ঐ মহিলাটির নয়, চিরকালের নারীর অতল রহস্য (সে বস্তুটি কি ?) ধরা পড়েছে। যদিও লেওনার্ডোর জীবনী বা ডায়ারি পড়লে এ কথা ভাবার বিরুদ্ধে কোনো কারণ পাওয়া যায় না যে শিল্পীর অন্যান্য ছবির মত ও ছবিও এক প্রতিকৃতি মাত্র, ফ্রানচেস্‌কো জোকোণ্ডো নামে ফ্লোরেন্সবাসী এক ভদ্রলোকের স্ত্রী যার বিষয়বস্তু। ছবি উৎকৃষ্ট কিন্তু শিল্পী এ কথা জানাতে চান নি যে ঐ সাধারণ মানুষটির মধ্যেই তিনি বিশ্ব-নারীর গূঢ়তম রহস্য দেখতে পেয়েছেন এবং তা প্রকাশ করে দিয়ে সৃষ্টিকর্তাকে হার মানিয়েছেন। অবশ্য এত বই লেখা হয়ে যাবার পরে আজো যে চণ্ডাল ও কথা ভাববে সে নিশ্চয় লেখাপড়া শেখে নি।

এই ছবিখানি লুভ্‌র মিউজিয়ামে প্রথম দেখার পর থেকে ও সম্বন্ধে যা কিছু পড়েছি ও শুনেছি তার কথা মনে করে দ্বিতীয় বার যখন সুযোগ হল খুব মনোযোগ দিয়ে আবার দেখব বলে গেলাম, কিন্তু সেদিন আরেকটি অপ্রত্যাশিত অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হল। আসল ছবির পাশেই রয়েছে কোন অজ্ঞাত শিল্পীর আঁকা ওরই এক অনুকরণ। অনেক চেষ্টাতেও দুইয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য ধরতে পারলাম না—ঐ প্রসিদ্ধ হাসির সূক্ষ্মতম রেখাতে পর্যন্ত। বলা বাহুল্য একের তুলনায় অন্যের দাম নগণ্য। কতগুলি দার্শনিক প্রশ্ন মনে আনাগোনা করল : দামের পার্থক্য কি শুধু খাঁটি আর মেকীর কারণে না ছবির গুণে ? যদি গুণে না হয়ে প্রথম কারণে হয় তবে তার মধ্যে ভক্তের উচ্ছ্বাস ও পণ্ডিতী মন্তব্যের স্থান কতখানি ? যদি এমন গুণে হয় যার তারতম্য জগতের অধিকাংশ লোকের চোখে ধরা পড়ে না তবে কোন ছবির কত দাম হওয়া উচিত ? আর, শুধু অনুকরণের

তুচ্ছ কায়দা দিয়ে অজ্ঞাত শিল্পী যে 'চিরকালের নারী'কে এমন নিপুণভাবে ধরে ফেললেন তাতে কি ঐ রহস্যময় বস্তুটির অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ হয় না ?

বলা বাহুল্য পূর্বোক্ত ঐ সব ঐতিহাসিক আবিষ্কার ও গবেষণার ফলে স্বর্গত প্রতিভাদের প্রতিষ্ঠা ক্রমশই আরো বেড়ে চলে। শ্রদ্ধা জানাবার জন্য আমাদের হাতের কলম নিশপিশ করতে থাকে। রবীন্দ্রনাথকে যে হয়তো একদিন দূর থেকে পাঁচ মিনিট মাত্র দেখেছে সেও আঁকছে তার 'ঘনিষ্ঠ, অন্তরঙ্গ চিত্র' এবং সেই চিত্রের সঙ্গে মিলিয়ে নতুন করে যাচাই করছে কবির রচনা। বিশ্বের বিগত প্রতিভারা আজ যদি দেখতে পেতেন তাদের পূজায় কত ফুল জড় হয়েছে, কত শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদিত হয়েছে, ভাবাবেগে কত লোকের কণ্ঠ রুদ্ধ, ভক্তিতে কত সহস্রের চোখ নিমীলিত, তবে সকলে না হলেও অনেকেই হয়তো অস্বস্তি বোধ করতেন। যারা শুধু নিজের সৃষ্টিই দিয়েছেন জগতকে, রক্ত মাংসের মানুষটাকে দেবতা বানাতে দেখে তারা নিশ্চয় শঙ্কিত ও দুঃখিত হবেন। এরা চেয়েছিলেন এদের বংশধররা ভক্তি-বিহ্বল আসক্তিতে শক্তিক্ষয় না করে আরো ভাল করে দেখুক তাদের ছবি, শুনুক তাদের গান, পড়ুক তাদের বই। এ দেশেও রবীন্দ্রনাথকে ঘিরে এমনি এক ধর্মালু সম্প্রদায় গড়ে উঠছে যাদের চলন বলন, চোখের চাউনি সবই যেন, কবির নিজের কথায়, 'মুগ্ধ ললিত অশ্রু গলিত'।

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আর একটা কথা মনে হয় বিদেশীর সঙ্গে আলাপে। ওরা যেন ভাবে বলতে চায়, হ্যাঁ টেগোরকে তো জানি, তাছাড়া আর কে আছে তোমাদের ? যারা এদেশে আসে এবং আমাদের সংস্কৃত মহলে মেশে রবীন্দ্র-স্তুতিতে তাদের কান আরো ঝালাপালা হয়।

প্রতিভাশীল ব্যক্তিরা রক্তমাংসেরই মানুষ—এক এক জন বরং আমাদের চেয়ে বেশী—যদিও শিল্পী হিসাবে সেই কারণে তাদের মর্যাদা মোটেই কমে না। অবিবাহিত বধির বেটোফেনের মন ছিল ক্ষুদ্র; ভাগ্‌নারও ছিলেন অসৎ ও স্বার্থপর—তিনি আবার নিজের শ্রেষ্ঠ বন্ধুর স্ত্রীকে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন। হাংগেয়ারিয়ান সুরকার লিস্‌ট বহু বছর ধরে এক কাউণ্টেসের সঙ্গে এবং পরে এক রাজকুমারীর সঙ্গে বাস করেছিলেন। ফরাসী লেখক ও দার্শনিক ভল্‌টেয়ার পনের বছর ঘর করেছিলেন পরস্ত্রীকে নিয়ে। মোঁপাসাঁ মরেছিলেন সিফিলিস রোগে উন্মাদ হয়ে। অস্কার ওআইল্ডকেও ঐ রোগে ধরেছিল এবং তাছাড়া যৌন বিকারের অপরাধে কারাদণ্ড হয়েছিল তার। সম্ভবত লেওনার্ডো দা ভিঞ্চিরও ছিল ঐ দোষ। 'ডন কিওটি'র রচয়িতা সেরভাণ্টেস চরিত্রদোষের জন্য কুখ্যাত ছিলেন। আমার মনে হয় গুনে দেখলে জিনিয়াসদের মধ্যে দুর্নীতি বেশী পাওয়া যাবে সাধারণ লোকের চেয়ে।

এমন কি শিল্পসৃষ্টিই যে সবার জীবনে সবচেয়ে বড় তাগিদ বা আকাঙ্ক্ষা ছিল তাও বলা যায় না। মিকেলেঞ্জেলো নাকি বলতেন নেহাত অনেকগুলো লোককে খাওয়াতে হয় বলে তার ছবি আঁকা, নয়তো তা চুলোয় যেতে পারে। তারই দেশের লোক বাপের সহজ সন্তান লেওনার্ডো দা ভিঞ্চি ছবি এঁকে অমর হয়েছেন বটে, কিন্তু তার প্রতিভা বহুমুখী—সেদিক থেকে বোধহয় একমাত্র গ্যেটে ও রবীন্দ্রনাথেরই তার সঙ্গে তুলনা চলে। লেওনার্ডোর জীবনে একটা বড় অংশ ছিল বিজ্ঞানের গবেষণা, ছবির রোজগারের অনেকটা এদিকে খরচ হত। বিজ্ঞানের বিবিধ ক্ষেত্রে তার অনেক জটিল ও সারগর্ভ প্রবন্ধ আছে, এবং নানাবিধ বৃহৎ গ্রন্থ রচনা করার যে পরিকল্পনা তার ছিল তাতে মনে হয় যে শিল্পে না হয়ে বিজ্ঞানে

অমর হলে তিনি হয়তো নিজেকে কম সার্থক মনে করতেন না।

তার লেখায় সাহিত্যের ছোঁয়াও অনেক জায়গায় পাওয়া যায়। বস্তুত মানুষ কিংবা প্রকৃতির কোনো দিক সম্বন্ধেই তার কৌতূহলের অন্ত ছিল না। মানুষের ছবি আঁকার আগে তিনি যেমন ডাক্তারী শাস্ত্র অনুসারে দেহটাকে কেটে ছিঁড়ে অধ্যয়ন করেছেন, তেমনি মানুষের স্বভাবও তার দৃষ্টি এড়ায় নি। ঋণ দেওয়া সম্বন্ধে বহু প্রসিদ্ধ প্রবাদবাক্য আছে—যথা, ধার দিলে টাকা ও বন্ধু দুইই হারাতে হয়, অথবা শেক্সপিয়ারের neither a borrower nor a lender be (ঐ এক স্তবকে এত কম কথায় এতগুলি বিজ্ঞ উপদেশ আছে যার তুলনা আর কোনো পিতাপুত্রের ইতিহাসে মিলবে না), কিন্তু এ সম্বন্ধে লেওনার্ডোর এক অখ্যাত মন্তব্যও অনেকের কাজে লাগতে পারে। "ধার দিয়ো না," তিনি লিখেছেন, "ধার দিলে তা ফেরত পাবে না, যদি পাও তো শিগগির পাবে না, যদি শিগগির পাও তো অচল পয়সা পাবে, যদি সচল হয় তবে বন্ধু হারাবে।"

আজ নবজাগ্রত ভারতের কৃষ্টি দিয়ে আমরা বিশ্বের শ্রদ্ধা অর্জন করতে চাচ্ছি। এর একটা বড় রাস্তা হচ্ছে চলচ্চিত্র, যা সহজে অনেক লোকের কাছে গিয়ে পৌঁছায় এবং মনে সাড়া জাগায়। গত কয়েক বছরের মধ্যে ইটালি ও জাপান সম্বন্ধে, সেসব দেশের লোকের প্রশ্ন ও দৃষ্টিভঙ্গি সম্বন্ধে বাইরের লোক অনেক বেশী জানতে পেরেছে তাদের উৎকৃষ্ট ফিল্মের মধ্য দিয়ে। বিদেশের জন্য তোলা ভারতের প্রথম ছবি 'আন' যখন লণ্ডনে দেখানো হচ্ছিল তখন লোকের ভীড় দেখে মনে হত ছবি বুঝি ভাল হয়েছে। কিন্তু যতগুলি পত্রিকা চোখে পড়েছে তার একটাতেও ঐ ছবির প্রশংসা দেখি নি, সবাই নিন্দা

করেছে হলিউডের পাঁচমিশেলী অনুকরণ বলে। বিদেশী ছবি সম্বন্ধে লোকের কৌতূহল আজ বেড়েছে, বিশেষত ভারত সম্বন্ধে অনেকেরই অনুসন্ধিৎসা, সেই কারণে প্রথম প্রথম তারা আমাদের নিকৃষ্ট ছবিও দেখবে—কিন্তু বেশী দিন নয়।

আর এক শ্রেণীর 'ভারতীয়' ছবি এখন ফ্যাশান হয়ে উঠেছে, তা হল ভারতে বিদেশী অভিনেতৃ সম্মেলনে বিদেশীর তৈরি ছবি। আগে ওরা আমাদের ঠাট্টা করে ছবি তুলত (মহারাজার হারেম বা নৃত্যরত গান্ধি), কিন্তু স্বাধীনতার পরে নাকি প্রযোজকরা নতুন দৃষ্টি নিয়ে ভারতে আসছেন সত্যিকারের ভারতীয় ছবি বানাতে। যদিও এ পর্যন্ত এই শ্রেণীর ছবি যে দুটো দেখেছি তার মধ্যে আহা মরি করার মত আমি কিছু পাই নি। 'দি রিভার' ছবির ভিত্তি হল ইংরেজ লেখিকার বাল্য স্মৃতি। তা এতই ব্যক্তিগত যে তা নিয়ে উচ্চাঙ্গের কাব্য হতে পারে, কিন্তু চলচ্চিত্রের মধ্য দিয়ে দেশবিদেশের সাধারণ দর্শকের মনে এই একান্ত নিজস্ব আত্মকাহিনী দাগ কাটতে পারে না। সেজন্য আমেরিকায় যখন ঐ ছবি চলছিল অনেকেই লক্ষ করেছি অর্ধেক দেখে উঠে যাচ্ছে। অবশ্য লোকের কৌতূহল ভাঙিয়ে সব দেশেই পয়সা পেয়েছে ছবিটি।

'দি রিভার' ছবি নিয়ে মাতামাতির প্রধান কারণ ছিল যে এতদিন পরে নাকি 'আসল ভারত'কে সত্যি করে দেখানো হয়েছে। কিন্তু এখানেও গল্পের কেন্দ্রে বিদেশী সমস্যা, বিদেশী নাটক, বিদেশী নট নটী। এদের পিছনে বাজার বা কারখানার পটভূমিকায় কৃষ্ণাঙ্গের ভীড়, যার মধ্যে একমাত্র খানসামা বা দরোয়ানের গায়েই জামা দেখা গেছে। হতে পারে এ 'বাস্তববাদ' কিন্তু এর জন্য আমাদের উচ্ছ্বাসে গদগদ হবার কিছু নেই। এতে কি আমাদের প্রতি বিদেশীর ভক্তি বেড়েছে? আগের দিনের ছবি দেখে তাদের মনে

যে নীরব প্রশ্ন জাগত যে ভারতে কুলি মজুর ছাড়া আর কিছু কি নেই তার জবাব এ ছবিতেও মেলে না। তাছাড়া তারা অবাক হয় ভেবে এর মধ্যে কুলির মনই বা আছে কোথায়। ভারতীয় মন নিয়ে ছবি তুলতে হলে তা আমাদের পরিচালকদেরই করতে হবে, বিদেশী ডিরেক্টার তা পারবেন না, তা তিনি যতই দরদী শিল্পী হন।

আমি এ পর্যন্ত বিদেশী ছবি যা দেখেছি তার মধ্যে প্রথম স্থান পায় Ladri di Bicicletti (সাইকেল চোর), দ্বিতীয় স্থান Rasho Mon (গভীর বনে)। এ ছবি দেখে ইটালি ও জাপান সম্বন্ধে আমাদের শ্রদ্ধা বাড়ে, 'দি রিভার' বা 'মনসুন' দেখে ভারত সম্বন্ধে তা হয় না।

উৎকৃষ্ট মৌলিক স্বদেশী ছবি তৈরি করা আমাদের পক্ষে বোধহয় সহজ হত যদি না খালি ইংরেজী ও আমেরিকান ছবিই অহরহ থাকত আমাদের চোখের সামনে। এসবের মধ্যে উৎকৃষ্ট ছবি নিশ্চয় হয়েছে এবং তাদের থেকে শেখার অনেক কিছু আছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার পরিধি সীমাবদ্ধ। ইংরেজী ভাষার ছবির তুলনায় অন্যান্য দেশের ছবি খুব কমই দেখেছি আমি, তবু তাদের মধ্যে যে কটার নাম এখন মনে আসছে, মৌলিকতায় তুলনীয় ততগুলি ইংরেজী ছবি মনে করতে পারব না। এবং আমি যতদূর জানি এর অধিকাংশই এ দেশে সাধারণ ভাবে দেখানো হয় নি। কয়েকটা নাম এখানে দিচ্ছি। ফরাসী : Panique (আতঙ্ক), A Nous la Liberté (আমরা মুক্ত), La Kermesse Heroïque (বীরাঙ্গনার হাট), La Partie de Campagne (বনভোজন), Joffroy (জফ্রোয়া), La Ronde (চক্র)। ইটালীয় : Roma Città Aperta (খোলা শহর রোম), Paisan (দেশের লোক), Pane, Amore e Fantasia (অন্ন, প্রেম ও কল্পনা)। রুশীয় : Battleship Potemkin।

জার্মান : The Last Will of Dr. Mabuse। চেকোস্লোভাকিয়ান : Ekstase (পুলক)।

এছাড়া বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য আরেকটি জাপানী ছবি যার ফরাসী সংস্করণটা দেখেছি—নাম La Porte de l'Enfer বা 'নরকের দ্বার'। এর কাহিনী 'রাশোমোনের' মত উজ্জ্বল নয় কিন্তু আগাগোড়া দৃশ্যপটের এমন মাধুর্য কোনো দেশেই আর কোনো ছবিতে দেখি নি। এই ছবি দিয়ে জাপান আবার কান্ (Cannes) উৎসবের চরম পুরস্কার নিয়ে গেছে ১৯৫৪ সালে।

মনের কথা

প্রবাদ বলে আমেরিকানের মন সর্বদা টাকার স্বপ্নে মুগ্ধ, লক্ষ লক্ষ ডলার ওড়াবে এই তার সবচেয়ে বড় উচ্চাশা। স্কটল্যাণ্ডের লোকও নাকি চিরজন্ম টাকার কথা ভাবে—কি করে খরচ না করবে সেই কথা; তাদের কৃপণতার গল্প দু চারটে সকলেরই জানা আছে।

পার্শ্ববর্তী আয়র্লণ্ডের লোক আবার খেয়ালী, রঙিন কল্পনার বিলাসী। সামান্য বিষয় নিয়ে তর্কে তারা দিন কাটিয়ে দিতে পারে, মাথাও ফাটাতে পারে, আবার পরমুহূর্তেই শত্রুর গলাগলি ধরে সুখ দুঃখের কথায় গদগদ হয়ে উঠতে পারে। দক্ষিণ ইটালি অথবা সিসিলির অধিবাসীদেরও এই ধরণের রগচটা স্বভাবের দুর্নাম আছে, যদিও আইরিশদের মত কাব্যিক মনের খ্যাতি নেই।

এত কাব্য ও কল্পনা সত্ত্বেও আয়র্লণ্ডে বিবাহ মোটেই জনপ্রিয় নয়। প্রতি চার জনের এক জন বিয়ে করে না এবং বাকি তিন জন দেরি করে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের লোকের চেয়ে বেশী বয়স পর্যন্ত। তাও দায়টা সেরে তারা ঘরের বাইরেই দিন কাটায়—আড্ডায়, খেলা বা রাজনীতির আলোচনায়, বাজিতে আর পানে—কারণ দায়িত্ব বস্তুটা মোটেই তাদের ধাতে সয় না। এই ঘর-ছাড়া মেজাজের সঙ্গে আর একটি জন্মগত প্রবৃত্তি যুক্ত হয়ে জাতটাকে প্রায় নিশ্চিহ্ন করতে বসেছে; তা হল দেশ ছাড়ার নেশা—বয়স হতে না হতেই প্রত্যেক আইরিশম্যানের পা চুলকায় বিদেশে গিয়ে বাস করার জন্য। এই যাযাবরবৃত্তি আর কৌমার্যের ফলে গত একশো বছরে ওদের লোকসংখ্যা কমে অর্ধেক হয়ে গেছে।

ক্ষুদ্র হলেও কিন্তু ওদের মত এমন বিচিত্র জাত জগতে আর

কমই আছে। এতখানি রোমান্স যে দেশের আকাশে বাতাসে তাদের লোকসংখ্যা কি করে এভাবে কমে যায় তার উত্তরে মনে হয় যে কাব্য ও কল্পনা সত্ত্বেও—হয়তো বা তারই খাতিরে—ওদের স্বভাবে একটা অন্তর্নিহিত স্পষ্ট ও হিসেবী দিকও আছে। যার ফলে, বলেছেন জনৈক লেখক, প্রেম ও প্রণয় আইরিশদের চোখে ঠাট্টার বস্তু ছাড়া আর কিছু নয়। সেই কারণে বিবাহের পথ মসৃণ নয়, যদিও যারা সংসার করে তাদের প্রতি মা ষষ্ঠীর অনুগ্রহ সাধারণত অধিকাংশ পাশ্চাত্য দেশের থেকে বেশী।

ওদের কৌমার্যবৃত্তির নাকি আর একটা বড় কারণ মায়েদের স্বার্থপরতা। ভাবী পুত্রবধূকে মা অত্যন্ত সন্দেহের চোখে দেখেন এবং একেবারে মনের মত না হলে—আর বেশ কিছু সম্পত্তির অধিকারী না হলে—গ্রহণ করেন না। তৃতীয়ত, ধর্মের প্রভাবও ও দেশে কিছুটা বিবাহের অন্তরায়।

ওদের সঙ্গে আমাদের স্বভাবের ও অবস্থার অনেক মিল আছে, ধর্মের ভয়ও দু দেশেই প্রখর, অথচ আশ্চর্য এই যে তার ফল হয়েছে উল্টো। আমরা শাস্ত্রের অনুশাসনে পুত্রার্থে বিয়ে করি, ওরা ব্রহ্মচর্য দিয়ে জীবনের পবিত্রতা রাখে।

আমাদের বিবাহে সন্তানের গুরুত্বই যে সবচেয়ে বেশী তার প্রমাণ সম্প্রতি নতুন করে পাওয়া গেছে। বেতারে ও সংবাদপত্রে 'বিশেষ বিবাহ' আইনের নানা আলোচনায় দেখেছি অনেকেরই মত এই যে সন্তানের খাতিরে বিবাহ-বিচ্ছেদ ব্যবস্থা অগ্রাহ্য করা উচিত, তা বাপ মার জীবন যতই দুর্বিষহ হক। এদের কথা শুনে মনে হয় যে যারা শৈশবে পিতা বা মাতা বিয়োগের ফলে অসম্পূর্ণ ঘরে মানুষ হয়েছে তারা যেন জীবনের সব সুখ সুবিধা,

আশা আকাঙ্ক্ষার থেকে বঞ্চিত থেকেছে। তাছাড়া, মানুষ যেন শুধু মা আর বাপ, স্বামী স্ত্রী বা প্রিয়া ও প্রেমিক নয়।

পারস্পরিক সম্মতিক্রমে বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রসঙ্গে বিরুদ্ধ 'যুক্তি' শুনে এক এক সময় বিস্ময়ে স্তম্ভিত হতে হয়। একবার এক বেতার আলোচনা-চক্রে উপস্থিত বিচক্ষণ ব্যক্তিরা সকলেই খুব সুচিন্তিত সুরে মন্তব্য করলেন যে এটা অত্যন্ত খারাপ হল কারণ এখন থেকে সামান্য গার্হস্থ্য কলহের পর স্বামী বা স্ত্রী বলে বসবে "এই রইল তোমার সংসার, আর আমি তোমার সঙ্গে ঘর করব না" অথবা "তোমার নাকের গড়নটা কোনোদিনই আমার ভাল লাগে নি, আমি চললুম অমুককে বিয়ে করতে" এবং সঙ্গে সঙ্গে বিচ্ছিন্ন করবে বিয়ে। শুনে মনে হল এরা কোনোদিন কাগজে পড়েন নি এ তথ্য যে বিয়ের পাঁচ বছরের মধ্যে বিচ্ছেদের আবেদন করা চলবে না, এবং আবেদনের পর অন্তত এক বছর অপেক্ষা করতে হবে নিষ্পত্তির জন্য। নাকের গঠন যতই বিশ্রী হক পাঁচ বছরে তা অধিকাংশ লোকেরই সয়ে যায়; আর সামান্য বাক্‌যুদ্ধের পরে যারা চলে যেতে মনস্থ করে তাদের মধ্যে রাগ যাদের এক বছরেও ঠাণ্ডা হয় না সেই লোকের সঙ্গে আর কাউকে একত্র বাস করতে বাধ্য করা সত্যিই অত্যন্ত নৃশংস ব্যাপার।

এ প্রসঙ্গে পার্লামেণ্টের ভিতরেও অনেক চমকপ্রদ অভিমত শোনা গেছে, বস্তুত ভিতরে বাইরে এত বিরুদ্ধ উক্তি উচ্চারিত হয়েছে যে এমন গণতান্ত্রিক দেশে কি করে ঐ আইন শেষ পর্যন্ত টিঁকল তা এক রহস্য—যার মীমাংসা বোধহয় আছে একটি লোকের মধ্যে। পারস্পরিক সম্মতি যথেষ্ট হবে বিচ্ছেদের জন্য এতে আপত্তি করে লোকসভায় বিরুদ্ধ দলের এক নেতা বলেছিলেন যে দুটো লাথি চড় রোজ খেলে ভারতীয় স্ত্রী সম্মতি দিতে দেরি করবে না

নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও। অর্থাৎ এঁর মতে যে সব স্বামীরা নিজের স্বার্থের জন্য লাথি মারতে দ্বিধা করে না তাদেরই সেই চরণ আশ্রয় করে পড়ে থাকা উচিত ভারতীয় স্ত্রীর, এবং এই ধরণের গার্হস্থ্য শান্তি বজায় রাখার জন্যই তাঁর আপত্তি ঐ আইনে। ইনি কোনো সাম্প্রদায়িক বা গোঁড়া ধার্মিক দলের নেতা নন, কংগ্রেসের চেয়ে 'অগ্রগামী' এক দলের সভাপতি।

ইংরেজরা আয়র্লণ্ডের পাশাপাশি বাস করে, কিন্তু তাদের মন ও মেজাজ সম্পূর্ণ বিপরীত। তারা গম্ভীর ধাতের লোক, সহজে আবেগ প্রকাশ করে না, নির্বিকার শৈত্যে সমাহিত মন—এই রকম তাদের ঐতিহ্য। এই চেহারা ঘরে যথার্থ হলেও দেশের বাইরে প্রায়ই সত্য নয়। ইংরেজ যখন বিদেশে বেড়াতে আসে তখন অনেক সময় তার মুখ খুলে যায় আশ্চর্য রকম, দক্ষিণ ফ্রান্সের সমুদ্র উপকূলে বা সুইস্ শৈলশিখরের হোটেলে তার মনের বাধা নিষেধ আলগা হয়ে পড়ে বেড়াবার আনন্দ সুসম্পূর্ণ করার আগ্রহে, অন্যান্য টুরিস্টদের সঙ্গে সমান তালে হৈ হল্লা করে সে।

ভারতের ইংরেজ আবার অন্য রকম, এখানে সে এক শ্রেণীর নতুন বাধা নিষেধের বশবর্তী। কলকাতার সওদাগরী আপিশের নিম্নতম ইংরেজ কর্মচারীও যদি কদাপি ট্রামে চড়ে অথবা সিনেমার দোতলায় না উঠে নিচে বসে তবে পরদিন তার চাকরি যাবার আশঙ্কা আছে। অথচ এখানে আমেরিকানদের দেখা যায় ট্রামে বাসে, যদিও টাকার গর্ব তাদেরই মানায় বেশী।

জার্মান চরিত্র সম্বন্ধে যে চিত্রটি আজ গড়ে উঠেছে দুটি মহাসমরের ভিত্তিতে তা প্রায় অমানুষিক। বলা বাহুল্য যারা যুদ্ধে জিতেছে তাদেরই বই আর পত্রিকায় ক্রমাগত আঁকা হয়ে থাকে এই ছবি।

হুকুম তামিল করতে পেলে ওরা নাকি আর কিছু চায় না এবং বিনা কারণে অন্যের উপর অত্যাচার করে এক পৈশাচিক আনন্দ পায়। সেই কারণেই স্বেচ্ছাচারী শাসনের প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র ঐ দেশ। ডিক্টেটরের ইঙ্গিতে কলের পুতুলের মত কাতারে কাতারে তারা যুদ্ধে যায় এবং সেখানে নিতান্ত নারকীয় অত্যাচারের স্রোত বইয়ে দেয় নির্বিকার চিত্তে। এত শত বছরের পাশ্চাত্য সভ্যতার মধ্যে বাস করেও, বিজ্ঞানে দর্শনে সংগীতে অবিস্মরণীয় সৃষ্টির স্বাক্ষর রেখেও, জার্মানরা আসলে আজ পর্যন্ত প্রায় বনমানুষ। আবার সেই সঙ্গে প্রায় মেয়েমানুষের মত কোমল ও ব্যাকুল তাদের মন। যে সৈনিক যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর চোখ উপড়ে ফেলতে এক বিন্দু দ্বিধা করবে না সেই হয়তো পরমুহূর্তে ভেউ ভেউ করে কেঁদে ভাসিয়ে দেবে। সেটা ঐ পৈশাচিক ব্যবহারের অনুশোচনা নয়—ঘরে ফেলে আসা বৌর কথা তার হঠাৎ মনে পড়েছে মাত্র।

আশ্চর্য নয় যে য়োরোপের অন্যান্য 'স্বাভাবিক' জাতি জার্মেনিকে বুঝতে পারে না এবং সেজন্য তাকে এতখানি ভয় করে। কে জানে কখন আবার তার রক্তলীলার রোখ চাপবে, অন্যের দেশ কেড়ে নিয়ে দাসত্বের অন্ধকার প্রসারের নেশায় উন্মত্ত হয়ে উঠবে সে। যাদের মনে এই ভয় তারা অবশ্য অনেক দিন আগেই অন্যের দেশ কেড়ে নিয়ে অনেক দাস সংগ্রহ করেছে—সেজন্যই জার্মেনির এই বিস্তৃতির প্রবৃত্তি আরো অসভ্য ঠেকে তাদের চোখে। আর আরো দূরে য়োরোপের বাইরে যারা বাস করে তাদের অনেকের দৃষ্টিতে মহাযুদ্ধ-গুলি দেখায় চোরে চোরে লড়াইয়ের মত।

জার্মান মনের যে বৈশিষ্ট্য আমার নজরে পড়েছে সবচেয়ে বেশী তা হল এক শিশু-সুলভ আনন্দ-প্রীতি বা উচ্ছ্বাসপ্রবণতা। মনে পড়ে রাইন নদীর তীরে ছোট্ট এক শহরে এক বর্ষাক্লান্ত বিরস সন্ধ্যা। ঐ

সব অঞ্চল বহু প্রসিদ্ধ জার্মান মদিরার জন্মভূমি, শহরে গ্রামে প্রতি পদে পদে weinstube বা পানঘরের সাক্ষাত মেলে। টুরিস্ট যারা আসে সন্ধ্যার পর তাদের কাজ হল এক ঘর থেকে আর এক ঘরে গিয়ে নতুন নতুন পানীয় আস্বাদ করা। কিন্তু তিন দিন ক্রমাগত বৃষ্টির পরে যখন আমেরিকানদের পর্যন্ত উৎসাহ নেতিয়ে পড়েছে, হোটেলে বসেই সন্ধ্যা যাপন করছে আর সকলে, তখন গভীর রাত্রি পর্যন্ত দল বেঁধে গলাগলি ধরে তারস্বরে গান করতে করতে রাস্তা দিয়ে চলেছে স্থানীয় অধিবাসীরা। আনন্দ করতেই হবে যে করে হক, বৃষ্টির বজ্জাতিতে দমে যাবার পাত্র তারা মোটেই নয় এই যেন তাদের ভাব।

একদিন বিকেলে রাস্তায় চলতে চলতে হঠাৎ দেখি সম্পূর্ণ অপরিচিত এক ব্যক্তি আমার মাথার কাছে এক হাতুড়ি তুলে ধরে বলছে, "আমি তোমাকে খুন করব।"

ওটা যে রসিকতা তা বোঝা গেল, তবু উদ্যত অস্ত্রের নিচে যথাসম্ভব আতঙ্কের ভান করে বললাম, "কেন ?"

হাতুড়ি নাচাতে নাচাতে ভাবী আততায়ী বিস্মিত ধৈর্যের সুরে জানালে, "কেন ? তোমাকে আমার ভাল লাগে না তাই।" তারপর নিজের মাথায় সজোরে মারলে এক ঘা, রবারের হাতুড়ি ড়ুম্ করে ফিরে এল। খুব খুশী হয়ে হাসতে হাসতে সে আমাকে বারে বারে জানালে যে এটা নিছক ঠাট্টা, আসলে সত্যিই সে আমায় মারতে চায় নি। বুঝতে পেরেছি তো আমি যে এটা ঠাট্টা ছাড়া কিছু নয় ?

লোকটি মধ্যবয়সী এবং যদিও কয়েক পাত্র পেটে পড়েছে মাতাল সে মোটেই হয় নি। অন্য দেশ হলে ঐ খেলনা হয়তো তার শিশু-পুত্রের হাতে দেখা যেত। জানি না যুদ্ধকালের জার্মান লোহার হাতুড়িই আমার মাথায় ভাঙত কিনা। যুদ্ধক্ষেত্রে কে কেমন ব্যবহার

করে দেখি নি—জার্মানও না, ইংরেজ বা ফরাসীও না। জার্মানদের অনেক অত্যাচারের খবর প্রকাশ পেয়েছে, তার কিছু অবশ্যই সত্য, কিন্তু তারা যদি যুদ্ধে জিতত নিশ্চয় তারাও বিপক্ষ দলের অনেক নেতা ও সেনাপতিকে ধরে জাঁকজমক করে ফাঁসি দিত এবং তার জন্য অপরাধ প্রমাণের অভাব হত না। ইংরেজ ও য়োরোপের অন্যান্য ঔপনিবেশিক জাতির অত্যাচার সম্বন্ধেও দু চার কথা বলতে পারে এমন লোক পৃথিবীর এদিকে ওদিকে খুঁজলে হয়তো পাওয়া যাবে। জার্মানদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় অভিযোগ যে ওরা ইহুদীদের দেখতে পারে না। কিন্তু কে যে তাদের ভালবাসে তাও তো বুঝি না। যুদ্ধ শেষ হবার অল্প দিন পরে ইংলণ্ডের এক সম্ভ্রান্ত বৈজ্ঞানিক ও অধ্যাপক আমার কাছে মন্তব্য করেছিলেন যে হিটলারের সঙ্গে তার অনেক বিরোধ থাকলেও ইহুদী-নীতি সম্বন্ধে মতভেদ ছিল না।

কিন্তু জার্মানদের মন যদি হয় দুর্বোধ্য, বিগত যুদ্ধের দ্বিতীয় শত্রু জাপানীদের চরিত্র একেবারেই অবোধ্য এবং তা আরো ভয়ংকর। ওরাও পরের পেট কেটে আনন্দ পায় কিন্তু নিজের পেট কেটে খুশী হয় আরো বেশী। শত্রুঘাতীকে বোঝা যায় যোঝা যায়, কিন্তু আত্মঘাতী পাগলের তল পাওয়া যায় না, সে করে হতভম্ব। এক জাপান-প্রবাসী বন্ধু গল্প করেছিলেন যে একদা মনোরম চাঁদিনী রাতে বেড়াতে বেড়াতে, ঐ মাধুর্য আর সহ্য করতে না পেরে, তিনটি জাপানী মেয়ে ছাত থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেছিল। আমাদের কবি অবশ্য লিখেছেন "এমন চাঁদের আলো, মরি যদি সেও ভাল, সে মরণ স্বরগ সমান", কিন্তু তার কথায় ও কাজে পার্থক্য ছিল অনেকখানি—কবিদের যেমন প্রায়ই থাকে।

জাপানীদের সব কিছু অদ্ভুত মনোবৃত্তির গোড়ায় নাকি ছিল

একটি মাত্র গলদ : ওরা সম্রাটকে দেবতার বংশধর বলে পূজো করে, যদিও আসলে তিনি মানুষ মাত্র। এরই ফলে যত যুদ্ধবিগ্রহ ও অন্যের অধিকারের প্রতি অন্যায় লোভ। কিন্তু রোগের আসল কারণ ধরা পড়ায় জেনার্‌ল ম্যাকার্থারের ডাক্তারিতে ওরা এখন সেরে গেছে। এখন ওরা সম্রাটকে পূজো করে না, করে আমেরিকান সেনাপতিদের।

পাশ্চাত্য জগতে সম্প্রতি রুশ লোকচরিত্র সম্বন্ধেই আলোচনা ও গবেষণা সবচেয়ে বেশী এবং এই আলোচনার থেকে বেশ লক্ষ করা যায় যে বিগত দশ বারো বছরের মধ্যে রুশদের স্বভাব অনেকখানি বদলে গেছে। যখন ওরা মিত্রপক্ষের হয়ে যুদ্ধ করছিল তখন ঐ জাতির অসমসাহসিকতা ও অন্যান্য গুণ অনেক দেখা গিয়েছিল, এখন ওরা ভেড়ার পাল ছাড়া আর কিছুই নয়, শাসকদের ভয়ে বেঁচেও মরে আছে। সাংবাদিক আর গ্রন্থকারদের লেখা পড়ে আমরা জেনেছি যে আবহাওয়া সম্বন্ধে মন্তব্য করতেও ও দেশে লোকে আগে দেখে নেয় কেউ শুনছে কিনা। ওরা মাত্র অল্প একটু ঘুমোয় প্রথমে রাত্রির দিকে, তারপর মধ্যরাত্রিতে বন্ধ দরজা জানলার ভিতরে বসে ঠকঠক করে কাঁপে। সেই সময় গুপ্ত পুলিশের দস্যুরা বার হয় তাদের দৈনিক শিকারের খোঁজে; কোন নিরপরাধ হতভাগ্যের বাড়ির সিঁড়িতে হঠাৎ ভারি বুটের শব্দ···দরজায় দ্রুত তীক্ষ্ণ করাঘাত ···তারপর হয় সাইবেরিয়া নয় কোনো ভোরে জেলখানার দেয়ালের সামনে গুলি বুকে নিয়ে মৃত্যু।

অবশ্য তার আগে তাকে সইতে হয় মৃত্যুর চেয়েও ভয়ংকর অভিজ্ঞতা, মিথ্যা স্বীকৃতি আদায়ের জন্য কল্পনাতীত কত শয়তানী অত্যাচার। অবশেষে সহ্যের সীমা অতিক্রান্ত হলে বিদেশী সাম্রাজ্য-বাদীর গুপ্তচর বলে নিজেকে যখন সে স্বীকার করে প্রবল

আত্মধিক্কারের সঙ্গে, অত্যাচারীরা তখন তাদের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে হত্যা করে সেই অর্ধমৃত হতভাগ্যকে।

অন্যান্য কমিউনিস্ট দেশেও নির্দোষীর হত্যাই শাসকদের প্রধান ক্রীড়া বলে মনে হয়। এই গুলির পাঁঠাদের সকলেই যে ক্ষমতা কাড়াকাড়ির কূটনৈতিক খেলায় তৎকালীন শাসকদের প্রতিদ্বন্দ্বী তা মোটেই নয়—তাহলে আর সারা জাতিকে বিনিদ্র রাত কাটাতে হত না। খেতের চাষী, কারখানার কর্মী বা আপিশের কেরানীরও হঠাৎ একদিন কপাল পুড়তে পারে। সংশোধিত কমিউনিস্টদের লেখা যে গাদা গাদা বই প্রতি বছর প্রকাশিত হয় তা পড়লে এতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকে না। যে কোনো ডিটেকটিভ উপন্যাসের চেয়ে এই সব বাস্তব ও প্রত্যক্ষ কাহিনী অনেক বেশী রোমাঞ্চকর। শুধু একটা ক্ষীণ প্রশ্ন মাঝে মাঝে মনের কোণে উঁকিঝুঁকি মারে: নির্দোষী জনতাকে হত্যা করে শাসকদের কি ফল হয়—এক বিদেশে দুর্নাম কেনা ছাড়া? এমন নির্বোধ কাজ তারা করবে কোন স্বার্থের লোভে? ছেলেবেলায় পড়া সেই রূপকথার দানবের কথা মনে পড়ে, প্রতিদিন যাকে একটি করে মানুষ খাওয়াতে হত। কিন্তু বাস্তব পৃথিবী রূপকথার জগত নয়। তাই ঐ সব বই পড়তে পড়তে যদিও আমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যায় খুনীর আশ্চর্য চাতুরিতে, অপরাধের আরো আশ্চর্য উদ্‌ঘাটনে এবং আততায়ীর মুখোশ উন্মোচনে যদিও অদ্ভুত রোমহর্ষণ হয়, তবু পড়া শেষ করে মনে হয় যে খুনের পিছনে শুধু যদি অভিসন্ধি একটা কিছু থাকত তাহলে বইখানি একেবারে সর্বাঙ্গসুন্দর হত।

সংশোধিত কমিউনিস্ট ছাড়াও আর এক শ্রেণীর লেখক ঐ সব দেশের দানবিক রক্তলীলা সম্বন্ধে আমাদের সতর্ক করতে সদাসর্বদা ব্যস্ত, বিশেষ করে এ দেশে। এরা দৈনিক পত্রিকার সম্পাদককে ঘন

ঘন চিঠি লেখে। কখনো কমিউনিস্ট দেশে না গিয়ে থাকলেও তাদের আভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্বন্ধে কিছু প্রমাণ করতে মাল মশলার এদের অভাব হয় না। এরা হল সেই ধরণের বিশ্বস্ত সূত্র যারা অনেক দিন আগেই মোটা মোটা সন্দর্ভ লিখে প্রমাণ করেছিল যে স্টালিন বা হো চি মিন আসলে আর ইহজগতে নেই, এবং পরে তাদের অস্তিত্বের প্রত্যক্ষ প্রমাণের পর বলেছিল যে সত্যিই যখন স্টালিনের মৃত্যু হবে তখন বাইরের লোকে তা জানতেও পারবে না (অবশ্য তারা ছাড়া)।

আজ রুশের সংক্রমণে চীনের লোকও তাদের স্বাধীনতা হারিয়েছে, কলের পুতুলের মত তারাও যুদ্ধ করতে যায় সম্পূর্ণ ইচ্ছার বিরুদ্ধে। 'মুক্ত জগতের' যে সব সৈনিক কোরিয়ায় প্রাণ দিয়ে শেষ পর্যন্ত পূর্বতন পরিস্থিতিই রক্ষা করল, যে সব ফরাসী যুবকের চরম ত্যাগের পর ইন্দোচীনের ভূমি বিনাযুদ্ধে শত্রুর হাতে তুলে দিতে হল, তাদের ইচ্ছার স্বাধীনতা হতভাগ্য চৈনিক সৈনিকের পক্ষে একেবারেই সুদূরপরাহত আদর্শ।

আমাদের ভাগ্য ভাল যে এত দারিদ্র্য, দুর্গতি, দুর্নীতির মধ্যেও আমরা ব্যক্তি-স্বাধীনতা সম্পূর্ণ রক্ষা করতে পেরেছি। নেহেরু চীন দেখে এসে দুঃখ করে বলেছেন যে সেখানে জনতা সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা করেছে, কেউ কারো জায়গা ছেড়ে এক পা নড়ে নি। তিনি বোঝেন নি যে সেটা তাদের অধীনতারই চিহ্ন, এক পা নড়ারও তাদের অধিকার নেই। আমরা যে গায়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে, পথ বন্ধ করে তাঁকে আমাদের ভক্তি ও উচ্ছ্বাস জানাই তাতে মাঝে মাঝে লাঠি নিয়ে তাড়া করতে হলেও আমাদের অবাধ স্বাধীনতাই প্রকাশ পায়।

মিস্টার অ্যাটলি চীন থেকে ফিরে মন্তব্য করেছিলেন, "অনেক

প্রাচ্য দেশের বাজার এর আগে দেখেছি, কিন্তু এই প্রথম দেখলাম বাজার যেখানে মাছি বা দুর্গন্ধ নেই।" এর থেকে দেখা যাচ্ছে যে চীনে মাছির পর্যন্ত সাধারণ চলাফেরার অধিকার নেই। আর আমাদের কলকাতা মহানগরীতে চৌরঙ্গীর গায়ে যদি যথেষ্ট দুর্গন্ধ থাকে তবু একথা আমরা গর্ব করে বলতে পারি যে এতবড় সাধারণ প্রস্রাবখানা জগতের আর কোনো শহরে নেই। খুবই সাধারণ—ইংরেজীতে যাকে বলে পাবলিক একেবারে তাই।

এক এক সময় ভাবি যাদের প্রধান শহরের প্রধান রাজপথে নাকে রুমাল না গুঁজে চলার স্বাধীনতা নেই, আর যাদের সারি বেঁধে না দাঁড়িয়ে, পথ ঘাট পরিচ্ছন্ন না রেখে উপায় নেই তাদের মধ্যে কে বেশী কৃপার পাত্র। কিন্তু সে যাই হক, চীনের মত যদি আমাদেরও ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হয় যেখানে সেখানে থুথু ফেলার, বাসে ট্রামে আসনের উপর পা তুলে দিয়ে বসার, পাঁচটায় আসব বলে দশটায়ও না আসার, তবে সেই আত্মাহীন যন্ত্ররাষ্ট্রে আমরা সম্ভবত দম আটকে মরে যাব।

কিন্তু আমাদের জাতীয় মনের সবচেয়ে বড় আনন্দ বোধহয় শব্দে। আকাশবিদারী কড়া নিনাদে ও চড়া হট্টগোলে আমাদের চরম পরিতৃপ্তি। এই চড়া ও কড়ার প্রধান উদ্দেশ্য অবশ্য অপরকে নিজের আনন্দের অংশ দেওয়া। আমরা রেডিও কিনি প্রধানত প্রতিবেশীকে শোনাবার জন্য এবং সেজন্যই ঘরে কেউ না থাকলেও যন্ত্রটা এমন ধাপে সর্বক্ষণ চালিয়ে রাখি যাতে এক মাইল দূরের লোকও সেদিনের বাজার-দর স্পষ্ট শুনতে পায়। জগতের আর সব জাত পূজা করে শান্ত নিঃশব্দ পরিবেশে, আমাদের কাঁসি ঘণ্টার কর্কশ ঝংকারে ভূত পর্যন্ত পালায়। তাছাড়া আসল পূজার বাইরে উৎসবের আসরে আধুনিক বিজ্ঞান আরো চড়া আওয়াজের

ব্যবস্থা করে আমাদের আনন্দ সেই অনুপাতে বাড়িয়ে দিয়েছে।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে জনৈক বন্ধুর এক প্রশ্ন যার কোনো সন্তোষজনক জবাব আমি দিতে পারি নি। প্রশ্ন করার আগে সে বিগত রাত্রির এক অভিজ্ঞতা বর্ণনা করল। সেদিন কি একটা পূজার তারিখ ছিল, যার ফলে পাড়ার সব নিষ্ঠাবান ছেলেরা স্থির করলে যে গোটাকয়েক ভাঙা রেকর্ড লাউডস্পিকারের সবচেয়ে চড়া ধাপে সারা রাত না বাজালে পূজার যথাযোগ্য মর্যাদা হবে না। ঘুমোতে যাবার সময় পর্যন্ত অবশ্য তাদের মতলবের দৌড় সম্পূর্ণ জানতে পারা যায় নি, বিছানায় শুয়ে বন্ধু ভাবলে গোলমাল নিশ্চয় শিগগিরই বন্ধ হবে; এই ধরণের আনন্দ তার নিজের অবশ্য ভাল লাগে না, কিন্তু সমাজে বাস করতে গেলে অন্যের দিকটাও দেখা দরকার। এই প্রশংসনীয় ঔদার্য বাঁচিয়ে রাখা কিন্তু ক্রমেই কঠিন হয়ে উঠতে লাগল। একটা রেকর্ড শেষ হতেই ক্লান্ত দেহে ঘুমে ঢুলে পড়ছে, আবার সঙ্গে সঙ্গেই পরবর্তী গান চুরমার করে ভেঙে দিচ্ছে ঘুম। গানের সংখ্যা কম এবং সবগুলি মুখস্থ হয়ে যেতে বেশী সময় লাগল না—অবশ্য শুধু সুরটুকু, কথা অনেক দিন আগেই অবোধ্য হয়ে গেছে—এবং কিছুক্ষণ সে খেলে চলল কোনটার পর কোনটা আসবে তা অনুমান করার খেলা। কিন্তু কর্কশ চীৎকার এক একবার রাত্রির নিস্তব্ধতা নতুন করে বিদীর্ণ করে আর তার দেহের স্নায়ুগুলিও যেন ঝনঝন করে বেজে ওঠে। শেষে আর সহ্য করতে না পেরে বাইরে এসে সে অনুষ্ঠান-কর্তাদের বুঝিয়ে বলতে চেষ্টা করল, কিন্তু তাতে কোনো কাজ হল না, এমন কি লাউডস্পিকার দু খাদ নামিয়ে দিতেও তাদের আপত্তি।

তখন থানায় গিয়ে সে দাবি করলে যে প্রত্যেকেরই ঘুমের অধিকার আছে, তার সেই অধিকার রক্ষা করা হক। কিন্তু সেখানে

জানতে পারা গেল যে ওছাড়া অন্যান্য অধিকারও দেশে আছে —মনে হল তার মধ্যে একটা এই যে মুষ্টিমেয় কয়েকটি অসাধারণ ব্যক্তি যদি এভাবে সহস্র সহস্র নাগরিকের দেহ মনের উপর যথেচ্ছা উৎপীড়ন করতে চায়—শিশুরা যদি জ্ঞান হারায়, রোগী যদি মরে যায়—তবু কেউ আপত্তি করতে পারবে না মধ্যরাত্রি পর্যন্ত। ঐ শেষের দুটো শব্দের মধ্যে যে একটুখানি আশার আশ্বাস ছিল তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে সে ঘরে ফিরে এল।

সেই সন্ধিক্ষণ এল গেল, অবস্থার কোনো পরিবর্তন হল না। যন্ত্রণায় অবসন্ন হয়ে সে এবার থানায় টেলিফোন করে জানালে যে মাঝরাত পেরিয়ে গেছে, আইনের রথ এবার বাঁধা রাস্তায় চলতে শুরু করতে পারে। কর্মচারীটি কিন্তু রথে স্টার্ট দিতে বিশেষ উৎসাহ দেখালেন না; এবং অনেক কথাবার্তার পর কারণটা বোঝা গেল এই যে তার মতে পাড়ার ছেলেদের চটানো খুব বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।

হাতে পায়ে কাঁপতে কাঁপতে প্রায় আধমরা অবস্থায় বন্ধু তার গল্প শেষ করলে, তারপর জবাফুলের মত চোখ মেলে বললে, "এর পরে আমাদের আরো পঁয়ত্রিশ কোটি নিরানব্বই লক্ষ নিরানব্বই হাজার নশো নিরানব্বই জন দেবদেবীর কথা ভাবতেই আমার জ্ঞান হারিয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা বলতে পার যে শহরে দিনদুপুরে মোটরের হর্ন বাজালে জরিমানা হয় সেখানে সারা রাত এ রকম নারকী হট্টগোল কি করে চলে?"

আগেই বলেছি, আমি পারি নি বলতে।

নন্দ ঘোষের দোষ

প্রকৃতির অপচয় দেখলে মনে হয় এ জগতে বেঁচে থাকাই সবচেয়ে আশ্চর্য ঘট্না। কড মাছ একযোগে পঞ্চাশ লক্ষ ডিম পাড়ে, তার প্রতিটি যদি বাঁচত তবে ছ বছরে অতলান্তিক মহাসাগর কড মাছের ঠাসাঠাসিতে জমে যেত। সিন্ধু-খরগোশ নামে এক প্রাণী আছে সে নাকি মিনিটে একচল্লিশ হাজার ডিম পাড়ে। পাছে এরা সব বেঁচে অন্যের পথ চলাচলের সমস্যা জন্মায় বা দুর্ভিক্ষ ঘটায় সেজন্য প্রকৃতি অধিকাংশকেই মেরে ফেলে সহজে সমস্যার সমাধান করে দেয়। ছোটকে বড় খাচ্ছে, বড় যাচ্ছে আরো বড়র পেটে। অতি সূক্ষ্ম প্রাণীর থেকে আরম্ভ করে আনুপাতিক হিসেব করলে দেখা যায় যে পাঁচ হাজার সের ডায়াটম খেয়ে পাঁচশো সের ক্ষুদ্র মাছ কোপেপড তৈরি হচ্ছে, তাদের খেয়ে পঞ্চাশ সের হেরিং মাছ, তার থেকে পাঁচ সের আরো বড় মাছ ম্যাকারেল, তার থেকে আধ সের প্রকাণ্ড মাছ টুনা—এবং তা খেয়ে মানুষের দেহ এক ছটাকেরও কম বাড়ে।

প্রকৃতিরই সৃষ্টি প্রাণ অথচ প্রাণের প্রতি বিন্দুমাত্র মায়া নেই তার নিয়মে। সর্বদা অপচয়ের খেলায় মগ্ন সে শিশুর মত। কোনো আপিশের কাজে যদি এই অপচয়ের এক ক্ষুদ্র ভগ্নাংশও দেখা দেয় তবে সে প্রতিষ্ঠান একদিনও টিঁকবে না। অবশ্য প্রকৃতিকে যদি বলা যায় যেখানে এক লক্ষ ডিমের থেকে মাত্র একশোটা মাছ বাঁচছে সেখানে ঐ একশোটা সৃষ্টি করলেই তো হয় তবে সে হেসেই খুন হবে। তাহলে বড় মাছেরা খাবে কি,—আমরা তার নিষ্ঠুরতাই দেখছি, দরদটা কি দেখছি না?

এই নিষ্করুণ জগতে মানুষও যে খাওয়াখাওয়ি কামড়াকামড়ি সহজ ভাবে গ্রহণ করে, প্রেম ও সম্প্রীতির থেকে তার স্বভাবও যে বেশী সহজে সাড়া দেয় যুদ্ধ আর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ডাকে তাতে বোধহয় আশ্চর্য হবার কিছু নেই। তবু শান্তি চাই শান্তি চাই বলে সে আবদার করেই চলেছে, দেশে দেশে শাসনকর্তারা বলেন যে দিবারাত্রি তাদের খালি শান্তিরই চিন্তা.

বর্তমান জগতের এ হল সবচেয়ে বড় ধাঁধা। যেখানে সবাই চাচ্ছি একই জিনিস সেখানে তা পাচ্ছি না কেন? কিন্তু এর উত্তরটা খুবই সহজ। আসলে শান্তি চাচ্ছি আমি একা, অন্যেরা শুধু চাওয়ার ভান করছে আর মনে মনে ছুরি শানাচ্ছে। বলা বাহুল্য এ অবস্থায় আমার নিজের ছুরিতেও মরচে পড়তে দেওয়া উচিত নয়। শান্তি কেন আসে না তার উত্তরে সকলেরই এই এক জবাব।

কেউ হয়তো বলবে, দেখ না আমার সামান্য একটু জমিদারি আছে বলে অন্যের কি ঈর্ষা। আসলে আমি কি এটা সাধ করে নিয়েছি। এই অশিক্ষিত অসহায় সরল প্রজাদের জন্য আমার এত কষ্ট হয় যে তাদের দেখাশুনো করার ভার কাঁধে না নিয়ে আমার উপায় নেই। এই বোঝাটা ফেলে দিয়ে পালিয়ে যাওয়াটা নিতান্ত কাপুরুষের কাজ হবে, ঈশ্বর কখনো আমাকে ক্ষমা করবেন না—তিনিই তো আমাকে নিযুক্ত করেছেন এই কাজে।...এই রকম বোঝা ছোট বড় আছে দেশে দেশে, সবচেয়ে ভারি আর প্রসিদ্ধ বোঝার নাম হল 'শ্বেতাঙ্গের বোঝা' বা White Man's Burden। বর্তমান জগতে এর ভার অনেকটা হালকা হয়ে গিয়ে থাকলেও এখনো প্রায়ই বোঝা কে বইবে তা নিয়ে ঝগড়াঝাটি হয়ে থাকে।

এই অশিক্ষিত অকৃতজ্ঞ জনতাদের নিয়ে শাসকদের মহা মুশকিল। কথায় কথায় তারা সমান অধিকার চায়, এটা বোঝে না যে

তার আগে তাদের শিক্ষিত হয়ে অধিকারের উপযুক্ত হতে হবে। স্কুলে ঢুকতে পারাও নিশ্চয় ঐ রকম একটা অধিকার, সেজন্য শিক্ষার সাহায্যে 'উপযুক্ত' হওয়াও অবশ্য তাদের সম্ভব হয়ে ওঠে না।

আর এক দল ঈশ্বর-নিযুক্ত আত্মত্যাগী বলে, বেশ নিশ্চিন্তে নিজের মনে ছিলাম আমি, হঠাৎ শোনা গেল অমুকের জমিতে নাকি সোনার খনি পাওয়া গেছে। পৃথিবীতে যদি দুষ্টু লোক না থাকত তবে আমার কিছু করার ছিল না, কিন্তু এক্ষেত্রে নিজের দেশ ও আত্মীয় জন ছেড়ে সাত সমুদ্র পেরিয়ে না গিয়ে আমার উপায় কি? জমির মালিককে লোভী ডাকাতদের হাত থেকে বাঁচাবে কে! আমার পাহারায় তার আর কোনো ভাবনা থাকল না। অবশ্য আমার সৈন্য-সামন্তদের জন্য আর নিজের খাওয়াপরার জন্য ঐ খনির লাভ থেকে সামান্য কিছু আমাকে নিতে হয়। কিন্তু এমনই লোকের লোভ আর অকৃতজ্ঞতা যে দেখ যাদের জন্য এত করছি তারাই এখন ঐ সামান্য নিরানব্বই পার্সেন্টও আমাদের দিতে রাজী নয়। শেষ পর্যন্ত আমি এক পার্সেন্ট কম নেব বললাম—যদিও তাতে আমার এক বেলা আহার জুটবে না—কিন্তু ওদের অসাধারণ লোভ এতেও সন্তুষ্ট নয়। সুতরাং দু চারটে গুলিগোলা ছুঁড়ে তাদের মাথায় সুবুদ্ধি ঢোকানো ছাড়া উপায় কি। আসলে আমার মত শান্তিপ্রিয় লোক জগতে আর দ্বিতীয় নেই।

কৃতজ্ঞতা এভাবে ক্রমশই কমে আসাতে বর্তমান জগতে এই ধরণের নিস্বার্থ উপকারের ক্ষেত্র আজ খুবই সংকীর্ণ। কিন্তু পরোপকারের জন্য যারা জন্মেছে তারা তা না করে পারে না। যেমন কাল্পনিক শত্রুর হাত থেকে দুর্বলকে বাঁচাবার জন্য সবলরা আজ উঠে পড়ে লেগেছে। দুর্বল যদি আশ্রয় না চায় তাদের আওতায় তবে তারই ভালর জন্য দু চারটে হুমকি এবং দরকার হলে চড়টা

চাপড়টা দিয়ে ডাক্তারি করতে হয় বই কি। তাতেও যদি সে বাঁচতে রাজী না হয় তবে বুঝতে হবে সেও শত্রুরই দলে।

এক এক সময় কেউ হঠাৎ আবিষ্কার করে যে তের পুরুষ আগে পাশের জমিটা তারই ছিল এবং জোর গলায় সেটা দাবি করে বসে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আর একজন জানিয়ে দেয় যে তারও আগে জমিটা ছিল তার পরিবারে। এমনি করে জমির প্রায় পঞ্চাশ পুরুষের ইতিহাস আবিষ্কৃত হয়, যদিও জমির বর্তমান মালিক অবশ্য কারো কথায় কান দেয় না। সুতরাং যার দাবি যত ন্যায্য সে তত তাড়াতাড়ি গিয়ে জোর করে তা দখল করে বসে। সবচেয়ে পুরনো যে বাসিন্দা তার নাম অবশ্য এত তর্কাতর্কির মধ্যে একবারও শোনা যায় না,— তার নিজেরও গলার জোর নেই, জিভটা অনেক দিন আগেই কেটে ফেলা হয়েছে। তা না হলে তো আজ আমেরিকা দিয়ে দিতে হয় ইণ্ডিয়ানদের, নিউ জীলাণ্ড মাওরিদের আর আফ্রিকা কাফরীদের হাতে। কিন্তু সে কথা পাগল ছাড়া আজ আর কেউ ভাবতেও পারে না।

এত কথার পর দুটো জিনিস পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে : (১) জগতে যুদ্ধ বিগ্রহের অনেক কারণ আছে, (২) এবং সেটা সর্বদাই হয় অন্যের দোষে।

যুদ্ধ যে সব ক্ষেত্রেই অপর লোকে আরম্ভ করে তার আরেকটা জ্বলন্ত প্রমাণ এই যে দেশে দেশে যুদ্ধ সংক্রান্ত মন্ত্রী যারা আছেন তাদের আপিশের নাম 'আত্মরক্ষা দপ্তর' বা 'দেশরক্ষা বিভাগ'— 'আক্রমণ দপ্তর' কোনো দেশেই পাওয়া যাবে না। আত্মরক্ষার জন্য এক দেশ দশ হাজার মাইল দূরে গিয়ে অন্যের দোর গোড়ায় এক দাগ টেনে দিয়ে বলে এর মধ্যে তুমি এক পা এগোলে আমার দেশের লোক ভয়েই মরে যাবে, সুতরাং তৎক্ষণাৎ পায়ের মালিককে বাষ্পীভূত

না করে আমার উপায় নেই। আত্মরক্ষার জন্য লোকে সাগর পেরিয়ে অন্যের দেশ দখল করে বসে। আত্মরক্ষার জন্যই শত্রুর উপর প্রথম বোমাটি ফেলতে হয়, এবং সে যখন নির্বোধের মত পত্রপাঠ একই ভাষায় জবাব দেয় তখন দেশের যুবকদের পাঠাতে হয় তাদের বাপ মা, স্ত্রী বোন আর সন্তানদের বাঁচাবার জন্য। দেশময় আত্মরক্ষার পবিত্র আগুন জ্বলে ওঠে —'পড়ি গেল কাড়াকাড়ি আগে কেবা প্রাণ করিবেক দান তারি লাগি তাড়াতাড়ি'।

এই যে হত্যাযজ্ঞ—যাকে ভল্‌টেয়ার বলেছেন 'টুপি পরা এক লক্ষ লোক পাগড়ি পরা এক লক্ষকে মারছে'—তাতে যোগ দিতে যদি কারো ক্ষীণ প্রতিবাদ শোনা যায়, কেউ যদি বলে এ পাগলামি, এর মধ্যে যুক্তি নেই, তবে কাপুরুষ আখ্যা দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে তাকে একঘরে করা হয়, শত্রুর চেয়েও ঘৃণ্য হয়ে ওঠে সে। তাই মনের কথা সকলের মনেই থেকে যায়, মাথা ফাটে তো মুখ কারো ফোটে না।

"মারছ কেন আমাকে ?" এই প্রশ্নের উত্তরে দার্শনিক পাস্কাল লিখছেন, "সে কি, তুমি কি নদীর ওপারে বাস কর না ? বন্ধু, তুমি যদি বাস করতে এপারে তবে তোমাকে এভাবে মারলে আমি হতাম খুনী; কিন্তু যেহেতু তুমি থাক ওপারে সেহেতু এটা ন্যায় এবং আমি হলাম মহাবীর।"

দেশে দেশে এমন নির্বোধ ব্যক্তি খুব কমই আছে যারা এমন জলের মত যুক্তি শুনেও সন্দেহ প্রকাশ করে, যেমন করেছিল ভল্‌টেয়ার রচিত আরেকটি চরিত্র: "আমাদের ঈশ্বর আদেশ করেছেন বিনা প্রতিবাদে শত্রুকে ভালবাসতে ও দোষ সয়ে যেতে; নিশ্চয় তাঁর মনে এই ছিল না যে কতগুলি খুনী লাল পোশাক পরে, মাথায় দু হাত লম্বা টুপি চাপিয়ে, গাধার চামড়া দিয়ে ঢাক বানিয়ে তাতে কাঠির বাড়ি মেরে সৈন্য সংগ্রহ করতে লেগেছে বলেই আমাদের

সাগর পেরিয়ে যেতে হবে ভাইয়ের গলা কাটতে।” কিন্তু আজকের জগতেও অধিকাংশ লোক সুবোধ ছেলের মত সমুদ্র পাড়ি দেয় দেশরক্ষা করতে এবং সেটাই এখনো ঈশ্বরের আদেশ বলে মান্য। বস্তুত, যুদ্ধ যেমন সর্বদা আত্মরক্ষার জন্যই হয়ে থাকে তেমনি ঈশ্বরকে দলে না নিয়েও আজ পর্যন্ত কেউ যুদ্ধে নামে নি।

ঈশ্বরের সুস্পষ্ট আদেশ পাবার আ৺গ শাসকরা কখনো প্রজাদের যুদ্ধে যেতে বলেন না, এবং তা বলার আগে তারা আপ্রাণ চেষ্টা করেন শান্তি-বজায় রাখতে। সকলেই জানে শত্রু যদি আগে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করে তবে যুদ্ধে যাবার কোনো দরকারই করে না। এই শান্তিপূর্ণ সমাধানের উদ্দেশ্যে দেশে দেশে নেতারা আগে সম্পূর্ণ অহিংস পদ্ধতি চেষ্টা করে দেখেন। হুমকি গালাগালিতে যদি কাজ না হয়, যদি নন্দ ঘোষ তার দোষ স্বীকার না করে, তবে ভীষণ থেকে ভীষণতর মারণাস্ত্র তৈরি করে তার চোখের সামনে নাচাতে হয় এবং উপযুক্ত অঙ্গভঙ্গি সহকারে তাকে সাবধান করে দিতে হয়। এর নাম ‘ঠাণ্ডা যুদ্ধ’। এক্ষেত্রে যে কোনো শান্তিপূর্ণ লোকের উচিত নিজের ভুল বুঝে আত্মসমর্পণ করা—শত্রু যদি তা না করে তো তাতেই বোঝা যায় তার মনে হিংসা আছে, হত্যাই তার মতলব। অত্যন্ত আশ্চর্যের কথা এই যে পিছিয়ে না গিয়ে উপরন্তু সে নিজেও টেক্কা দিতে চায় মারণাস্ত্র তৈরির প্রতিযোগিতায় এবং বর্বর ভাষায় গালাগালি দিতে ও চোখ রাঙাতে আরম্ভ করে। তখন অবশ্য তার থেকে আরো এক কাঠি উপরে না গিয়ে আর উপায় থাকে না। এই রকম শান্তিপূর্ণ চেষ্টায় তর্কাতর্কি করতে করতে হঠাৎ এক সময় হাতের বন্দুকটা ছুটে যায়, আরম্ভ হয় ‘গরম যুদ্ধ’ আর আত্মরক্ষার পালা।

শিশুকালে সঙ্গীদের সঙ্গেও অবশ্য ঠিক এই ভাবে কত ঝগড়ার

সূত্রপাত হয়েছে, কতবার দেখেছি ধমকের বদলে ধমকই খেতে হয় ও দিতে ইচ্ছে করে, তবু ঠাণ্ডা যুদ্ধে যে শত্রু নিপাত হয় না তার বিস্ময় আজো আমাদের কাটল না। কিন্তু যা কোনোদিন হয় নি তা কখনো হতে পারে না এমন নৈরাশ্য নীতি আমাদের নেতারা মানতে রাজী নন। তাই শান্তির শেষ চেষ্টার খাতিরে তারা আজো 'আরো ভীষণ' বোমা বানিয়ে চলেছেন।

অধিকাংশ সময় স্কুলের ছেলের মত ব্যবহার করলেও শান্তির কর্ণধাররা মাঝে মাঝে সভায় বসে সমস্যার মীমাংসা করতে চেষ্টা করেন। কিন্তু সেখানেও নন্দ ঘোষের দোষে প্রথমেই বিপদের সূচনা হয়। সভা করতে দুই পক্ষই রাজী হয়েছে, শুধু তাই নয় তারা একই টেবিলে বসবে এবং বাক্যালাপও করবে (অবশ্য হাসি নিষেধ) এই ঘোষণা শুনে জগতের লোক প্রায় এক সপ্তাহ ধরে আনন্দ করার পর জানা যায় যে ভিতরে ফাটল দেখা দিয়েছে। অর্থাৎ আলোচ্য বিষয় কি কি হবে তা ঠিক হয়ে থাকলেও কোনটা আগে কোনটা পরে আলোচনা হবে সে বিষয়ে মতৈক্য হচ্ছে না। সুতরাং এই গুরুতর বিষয়ের মীমাংসার জন্য আগে আরেকটা সভা প্রস্তাবিত হয়। দু পক্ষই তাতে রাজী হয়েছে দেখে জগতের লোক আবার স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে দু সপ্তাহ ধরে আনন্দ করে। তখন জানা যায় যে এই দ্বিতীয় সভার স্থান ও কাল সম্বন্ধে মতবিরোধ দেখা দিয়েছে। দুই পক্ষের নেতারা সজোরে জানিয়ে দেন যে এ সম্বন্ধে অপর পক্ষের নির্বাচন তাদের প্রতি অত্যন্ত অপমানকর, সকলেই স্পষ্ট বুঝতে পারে যে অমুক জায়গায় গিয়ে সভা করা মানেই দেশের সমস্ত আত্মসম্মান খোয়ানো। এ সম্বন্ধে নেতাদের ভাষণের উষ্ণতা দেখে মনে হয় এই ধরণের দাসখতের চেয়ে প্রথম সভার আলোচ্য বিষয় বরং চাপা পড়ে থাকবে তাও ভাল। সেটা যে কি ছিল

সাধারণ লোকের এখন আর তা ভাসা ভাসাও মনে পড়ছে না— হয়তো কোনো একটা ক্ষুদ্র দেশের স্বাধীনতা তার সঙ্গে জড়িত—কিন্তু পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে যে স্থান কালের মত গুরুতর বিষয়গুলির মীমাংসা আগে না হলে ঐ সব আলোচনা উঠতেই পারে না। তারপর যদিও বা অনেক চেষ্টার পর এই জটিল তর্ক কোনোরকমে মেটে, সঙ্গে সঙ্গে আরো কত কঠিন সমস্যা দেখা দেয়! সভার টেবিলটা গোল হবে না চৌকোণ, কে কার পাশে বসবে, এসব দুর্ধর্ষ সমস্যার কথা ভাবলে বিশ্বশান্তির আশা আকাশের চাঁদের মতই দূরে সরে যায়। কিন্তু তবু আমাদের সুযোগ্য সহিষ্ণু শান্তিগতপ্রাণ নেতারা হাল ছাড়েন না, ঐ ভাবে কঠিন থেকে কঠিনতর সমস্যার সঙ্গে লড়তে লড়তে তারা প্রথম প্রশ্নের সমাধান থেমে ক্রমে পিছিয়ে চলেন।

এক খাপছাড়া গল্প

গত কয়েক বছরের মধ্যে পৃথিবী যেন অনেকখানি ছোট হয়ে গেছে। কিছু দিন আগেও দেশ বেড়ানো যাদের কাছে ছিল স্বপ্নের বস্তু তারা এখন সহজেই দূর দূরান্তরে পাড়ি দিচ্ছে। আর যাদের কাছে তা সহজ ছিল তারা এখন এই সংকুচিত গ্রহটার একঘেয়েমিতে বিরক্ত হয়ে অনুসন্ধানী দৃষ্টি মেলেছে আকাশের দিকে। চাঁদ কিংবা মঙ্গলগ্রহে বেড়াতে যাবার তোড়জোড় এরই মধ্যে বেশ জমে উঠেছে।

প্রায় পাঁচ বছর হয়ে গেল চাঁদে জমি কিনতে চেয়ে প্রথম দরখাস্ত এসেছিল আমেরিকান সরকারের কাছে। যাদের ধারণা যে আমেরিকার সীমান্ত মাত্র বাঁ দিকে চীনের আর ডান দিকে য়োরোপের দরজা পর্যন্ত বিস্তৃত তাদের ভৌগোলিক জ্ঞান যে অত্যন্ত সামান্য এর থেকে তা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে। দেশরক্ষার জন্য চাঁদেও যে তাদের একাধিপত্য স্থাপিত হয়েছে দরখাস্তকারীরা নিশ্চয় তা জানত। কিছু দিন আগে নিউ ইয়র্কের এক গ্রহ-ঘর বা প্ল্যানে-টেরিয়াম আরো দূর দূরান্তরে যাত্রীদের নিয়ে যাবার আমন্ত্রণ জানিয়ে এক বিজ্ঞাপন দিয়েছিল। রকেট চাঁদে নিয়ে যাবে মাত্র সাড়ে ন দিনে (২৪০ হাজার মাইল), শনিগ্রহে পৌঁছাতে লাগবে ৩৩৩ দিন (৭৯ কোটি মাইল)। পৃথিবীর সব জায়গা থেকে হাজার হাজার দরখাস্ত এসে হাজির হল। কেউ চায় চাঁদে হোটেল খুলতে, কেউ চায় শুক্রগ্রহে ক্রীড়ামঞ্চ বানাতে। এক বিচক্ষণ ব্যক্তি বুদ্ধি করে বীরপুরুষদের মধ্যে গোটা দুয়েক মেয়েমানুষ নিয়ে যাবার কথাও ভেবেছিল—বংশরক্ষার খাতিরে।

অনেকেই অবশ্য ঠাট্টা ধরতে পেরেছে, কিন্তু কয়েকজন বোধহয়

সত্যিই বাক্স গোছাতে আরম্ভ করেছিল ; এরা এই পুরনো পৃথিবীটার উপর এতই বিরক্ত যে দুত্তোর বলে সব কিছু ছেড়ে ছুঁড়ে যাবার পন্থী। অধিকাংশেরই চোখ অবশ্য চাঁদের দিকে। চাঁদ যে শুষ্ক ছাইয়ের বন্ধ্যা মরুভূমি, সে যে আমাদের শ্বাস রোধ করে অথবা কখনো জমিয়ে কখনো তাতিয়ে মেরে ফেলতে পারে এ কথা কে বিশ্বাস করবে! প্রেমিকের বা রূপকথার চাঁদে আর জ্যোতির্বিদের চাঁদে আকাশ পাতাল্ তফাৎ।

গত যুদ্ধে রকেট বোমা তৈরির ফলে ও আণবিক শক্তির রুদ্ধ দুয়ার খুলে যাওয়াতেই অবশ্য আজ এ সব পরিকল্পনা সম্ভব হচ্ছে। যারা আধুনিক বিজ্ঞানকে সর্বনাশী বলে গালাগালি করে তাদের এ দিকটাও ভেবে দেখা উচিত। হাইড্রোজেন বোমার ছায়ায় পৃথিবী হয়তো আজ ধ্বংসের মুখে, কিন্তু যদি আমরা আণবিক রকেটে চড়ে গিয়ে আশেপাশের গ্রহ উপগ্রহগুলি নষ্ট করে আসতে পারি তবে হয়তো আমাদের হাত নিশপিশ করা বন্ধ হবে, পৃথিবী বেঁচে যাবে। তাছাড়া বিজ্ঞান এমন আবিষ্কারও করে যা শুধু বাঁচায়, মারে না। পেনিসিলিন জাতীয় ওষুধগুলির কথা আমরা কে না জানি, এমন কি বর্তমান জগতে ঐ সব 'তাজ্জব দাওয়াই' দিয়ে চিকিৎসিত না হওয়াই বেশ কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ হাইড্রোজেন বোমার স্বাদ এ পর্যন্ত পেয়েছে মাত্র জনকয়েক জাপানী জেলে। অবশ্য তাছাড়া ঐ ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর মধ্যে আছে প্রশান্ত মহাসাগরের কয়েকটি আণুবীক্ষণিক দ্বীপের অধিবাসীরা। কিন্তু তারা এতই অসভ্য যে তাদের নিয়ে কোনো ভদ্রলোকের মাথা ঘামানো আজ প্রায় আন্তর্জাতিক শিষ্টতা বিরুদ্ধ।

এই সব আলাপ হচ্ছিল মোহনলালের সঙ্গে। মোহনলাল আর আমি এক ক্লাসে পড়েছিলাম কয়েক বছর। যদিও সেকালে খেলার

গুণে আর সুগঠিত শরীরের খাতিরেই দলে ওর আদর ছিল বেশী, ওর কথা শুনতেও আমার বরাবরই ভাল লেগেছে। অনেক দিন পর হঠাৎ তার সঙ্গে আবার দেখা। সে ঘটনার স্থান কাল সম্বন্ধে আগে দুকথা বলা দরকার।

ইংরেজ যেমন আড্ডা দেয় ধূমভারাক্রান্ত পাব-ঘরে জলীয় বিয়ার হাতে নিয়ে, ফরাসীদের বিশ্রাম আর খুচরো আলাপ জমে খোলা আকাশের নিচে ভেরমুথ, দুবোনে বা কোনিয়াকের আওতায়। ফুটপাথের অর্ধাংশে ওদের চেয়ার সাজানো। (আমাদের জাতীয় জীবনে ফুটপাথের দান বোধহয় আরো বেশী; বিবিধ দোকানদার, গরু ছাগল ও ইঁটের স্তূপ সেখানে পথিককে প্রায় রাস্তায় বার করে দিয়েছে।) বিকেলে কাজ শেষ হলে ফরাসীরা বাড়িতে চা খেতে ছোটে না, বেড়াতে বেড়াতে রাস্তার কাফেতে এসে বসে। বন্ধু বা বান্ধবীর সঙ্গে খোশগল্পে প্রহর কেটে যায়; লেখক শিল্পী দার্শনিকের কত অমর সৃষ্টির সূত্রপাত হয় কাফের আলোচনায় অথবা একলা বসে সন্ধ্যার ধীর পদক্ষেপ দেখতে দেখতে। ইতিমধ্যে apéritifএর সাহায্যে জঠর প্রস্তুত হয় ডিনারের জন্য। তখন কেউ উঠে ঘরে ফেরে, কেউ পথেই শেষ করে খাওয়া।

এমনি এক সন্ধ্যায় প্যারিসের বাম তীরে বুলেভার দু মঁপার্নাস রাজপথে বিশ্রামের জন্য বসেছি, হঠাৎ অদূরে চোখে পড়ল মোহনলালকে। সামনে কফি, হাতে সান্ধ্য কাগজ। উঠে গিয়ে বসলাম ওর সঙ্গে।

পরস্পরের খবরাখবর নিতে নিতে গার্সঁ এসে দাঁড়াল। মোহনলাল আমার দিকে চেয়ে বললে, "তুমি বোধহয় ককটেইল নেবে একটা কিছু।"

আমি মার্টিনি হুকুম করলাম, সে তার সঙ্গে যোগ করলে, "Et un Pernod pour moi।"

লোকটি চলে গেলে মোহনলাল বললে, "এর পরে একসঙ্গে ডিনার খাব কিন্তু। আমার অবশ্য ঘরে রান্নার বন্দোবস্ত নেই—একলা লোক, বাইরেই খাই।"

আমি আমেরিকার থেকে ফিরছি শুনে সে বললে, "আশ্চর্য দেশ আমেরিকা। ওদের কথাই পড়ছিলাম।" বলে সে France Soir পত্রিকা খুলে হাইড্রোজেন বোমা পরীক্ষার খবর দেখালে। তার থেকেই উপরোক্ত আলাপের সূত্রপাত।

তখন হেমন্তের বাতাসে সবে শীতের ছোঁয়া লেগেছে। প্যারিসের অগণ্য গাছের থেকে ক্রমাগত পাতা ঝরে পড়ছে রাস্তায়। দিনের আলো মরে গিয়ে সামনের বাড়িগুলির ঢালু স্লেটের ছাতের উপরে আকাশের নীল ক্ষণে ক্ষণে গাঢ় হয়ে উঠছে, দু একটা তারাও দেখা দিচ্ছে।

সেদিকে চেয়ে মোহনলাল বলছিল, "আমেরিকানরা যদি চাঁদের সঙ্গে টুরিস্ট সার্ভিস করে তবে আর যাই হক য়োরোপে ওদের ভীড় কমবে। যুদ্ধের পরে ওদের যে আক্রমণ আরম্ভ হয়েছে, যুদ্ধের আক্রমণ তার কাছে হার মানে। য়োরোপের লোক আমেরিকা আবিষ্কার করেছিল সাড়ে চারশো বছর আগে, আর আমেরিকানরা য়োরোপ আবিষ্কার করেছে গত যুদ্ধে।"

আমি হেসে বললাম, "কি রকম?"

"যুদ্ধ করতে এসে ওরা যেন প্রথম দেখলে য়োরোপ। তারপর দেশে ফিরে জামা বদলে এখন টুরিস্ট হয়ে আসছে, স্রোতের পর স্রোত।"

"য়োরোপের লোক ওদের খুব ভালবাসে না জানি, কিন্তু আমেরিকানরা বলে ডলার-দাম্ভিক টুরিস্টদের দেখেই ওদের জাতকে বিচার করা অনুচিত। আমারো মনে হয় কথাটা ঠিক, আসলে ওরা

লোক কিছু খারাপ নয়। তুমি য়োরোপে এত দিন রয়েছ, একবার ও দেশটা দেখে এলে না?"

সে কিছু বলার আগেই গার্স* এসে দুটি পাত্র রাখলে আমাদের সামনে। ওর ঘন, হলদে পানীয়তে জল মেশাতে মেশাতে মোহনলাল্ বললে, "গত বছর ঘুরে এসেছি, অবশ্য মাত্র দশ দিন ছিলাম শুধু নিউ ইয়র্কে।"

একবার মনে হল সে আরো কিছু বলবে, কিন্তু চামচে দিয়ে এক টুকরো বরফকে নিবিষ্ট দৃষ্টিতে ধাওয়া করতে করতে সে চুপ করেই রইল। একটু পরে আমি বললাম, "এতদিন এদিকে কাটালে, এখনো একা কেন হে? তোমাকে দেখে মনে হয় লোকে যে বলে শ্বেতাঙ্গিনীরা শেষপর্যন্ত অর্ধাঙ্গিনীর ভূমিকায় আমাদের মেয়েদের কাছে পাত্তা পায় না হয়তো সে কথা সত্যি।"

"কে বলে ও কথা?"

"আমাদের মেয়েরা।"

মোহনলাল হেসে বললে, "কি জানি, আমি বোধহয় unlucky in love। যদিও বিয়ের প্রস্তাব একবার সত্যিসত্যিই করেছিলাম।" মোহনলাল গ্লাসে চুমুক দিলে, তারপর ঘড়ির দিকে একবার চেয়ে বললে, "শুনবে সে গল্প?"

এ বইয়ে মোহনলালের গল্প কারো কারো কাছে হয়তো খাপছাড়া ঠেকবে, যদিও সকলের কাছে নয়। কিন্তু গল্পের বই কোনোদিন লিখব কিনা তার ঠিক নেই, এবং সেই কারণে আমার এই অভিজ্ঞতা না বলা থেকে যেতে পারে এই ভয়ে এ কাহিনী এখানে লিখে দিচ্ছি।

তুমি বোধহয় জান জাপানী যুদ্ধ শেষ হবার আগেই আমি ইংলণ্ডে

চলে আসি। প্রায় বছর খানেক এক কারখানায় এঞ্জিনিয়ারিং শেখার পর ওরা আমায় জানালে যে ইচ্ছে করলে দেশে ফেরার আগে ওদের ব্যাবসার কাজকলাপও আমি কিছুটা শিখে নিতে পারি। যেসব যন্ত্রপাতি ওরা বানায় য়োরোপের বাজারে তা বেচার জন্য ওদের লোকজন সর্বদাই কন্টিনেণ্টে যাতায়াত করে; মাঝে মাঝে তাদের সঙ্গে গিয়ে আমারও য়োরোপের কিছুটা দেখা হবে ভেবে সাগ্রহে রাজী হলাম। য়োরোপের বিচিত্র দেশগুলির সঙ্গে প্রেমে পড়তে আমার বেশী দেরি হল না।

একবার ওদের প্যারিস আপিশে লোক কম ছিল বলে আমাকে সেখানে কিছু দিন থাকতে হল। এ কাজের জন্য বেশ ভাল টাকাই আমি পেতাম। মাসখানেক পর ওদের লোক এসে গেল, কথা ছিল আমি তখন প্যারিস ছাড়ব, কিন্তু ইতিমধ্যে আমার ইচ্ছে অন্য রকম দাঁড়িয়েছে—ওদের বলে কয়ে থেকে গেলাম। ফরাসীরা নাকি গোলমেলে ব্যাপারের গোড়ায় সর্বদা মেয়েমানুষ খুঁজে পায়, এখানেও তাই ছিল—চমৎকার এক দেমোয়াসেল। ইংরেজ মেয়ের তুলনায় ফরাসী তরুণীর মোহ একেবারে অন্য রকম। ইংরেজ মেয়েরা যেন সর্বদা পুরুষ হতে চেষ্টা করছে, কিন্তু এদের পোশাকে প্রসাধনে কটাক্ষে সারা জীবন মেয়ে হবারই ধ্যান। কোরিন বোধহয় এই কারণেই আমাকে সবচেয়ে বেশী মুগ্ধ করেছিল। আমার জীবনে সে-ই প্রথম মেয়ে, দেশী বা বিলেতী।

এই প্রেম অনেকটা ঝড়ের মত এসে পড়ল আমাদের ওপর, অন্তত আমার ওপর। অবসরের সময়টুকু রোজ কাটত আমাদের একসঙ্গে। প্যারিসের মনোহারিণী মূর্তি সে-ই প্রথম আমাকে দেখিয়েছে এক এক করে। যুদ্ধের পর তখন প্যারিসের মলিনতা আস্তে আস্তে মুছে যাচ্ছে, সবে তার ম্লান মুখে হাসি দেখা দিয়েছে। এর মধ্যে

কোরিনকে মানাত ভাল, সেও সর্বদাই হাসছে আর আনন্দ করার কথা ভাবছে। লেখাপড়া বিশেষ করে নি, সামান্য এক আপিশে কাজ করে, কিন্তু সহজ বুদ্ধি আর বিবেচনায় তার মন ছিল উজ্জ্বল। এমন একটি প্রাণীকে জীবনের সঙ্গী করে নেওয়ার স্বপ্নে আমার মন বিভোর হয়ে উঠল।

অবশেষে একদিন বললাম বিয়ের কথা। লুক্সেমবুর্গ কাননে এক গ্রীষ্ম সন্ধ্যা। সেদিনের বিস্ময় কখনো ভুলব না, যদিও এখন হাসি মনে মনে। কোরিন আপত্তি করলে বিয়েতে, বললে কেন এইতো বেশ আছি আমরা পরস্পরের ভালবাসার মধ্যে—বিয়ের কথা কেন বলছ।

আমি বললাম, "তুমি কি কোনোদিন বিয়ে করবে না ?"

সে মুখ ফিরিয়ে বললে, "Mais oui, তবে ···"

"তুমি নিজেই বলছ আমাকে ভালবাস, তবে না কেন ?"

"বাসি, খুব বাসি, আরো বাসব—mon chéri, আমার সবই তো তুমি পেয়েছ," মুখের কাছে মুখ নিয়ে এল সে, "কিন্তু···"

বাড়ি ফিরে সে রাত্রি খালি এই ধাঁধার মীমাংসার চেষ্টায় কাটল। ওর কি আর কেউ আছে ? না, তাহলে রোজ এতটা সময় আমার সঙ্গে কাটতে পারে না। ও কি টাকার লোভে বিয়েতে ভালবাসা বিসর্জন দিতে চায় ? কিন্তু টাকার প্রতি খুব আসক্তি তো ওর দেখি নি। ভাল জিনিস কিনতে পেরে ওরও অবশ্য আনন্দ হয়েছে কিন্তু তেমনি আবার খুঁজে খুঁজে সস্তা রেস্তরাঁ বার করতে বা বাসে চড়ে বেড়াতেও ওর উৎসাহ কিছু কম দেখি নি। অবশেষে অন্ধকারের মধ্যে একটু যেন আলোর রেখা দেখা দিল, কতগুলি জিনিস মনে পড়ল যা আগে কখনো আমল দিই নি। মনে পড়ল এক সন্ধ্যায় ওর আপিশ ছুটির পর ওকে নিয়ে আসার কথা ছিল, ও বলেছিল দরজার

সামনে না দাঁড়িয়ে রাস্তার ওপারে অপেক্ষা করতে। মনে পড়ল নেহাত দায়ে না পড়লে ওর কোনো বন্ধুর সঙ্গে ও কখনো আমার পরিচয় করিয়ে দেয় নি। একদিন এক বান্ধবীকে দূর থেকে আসতে দেখে ও তাড়াতাড়ি কাফের টেবিল ছেড়ে উঠে পড়ল, এগিয়ে গিয়ে ওর সঙ্গে উল্টো দিকে খানিকটা হেঁটে আবার ফিরে এল।

পরদিন সকালে দাড়ি কামাবার সময় ভাল করে একবার নিজের গায়ের রংটা লক্ষ করে দেখলাম—যে কথা এর আগে একবারও মনে হয় নি। কেন মনে হয় নি তা ভেবে নিজের ওপর রাগে কাটা ঘায়ে নুন পড়ল বারে বারে।

এর পরে কয়েকটা দিন ছটফট করে কাটল, অধিকাংশ সময় রাস্তায় রাস্তায়। কোরিন বারে বারে আমার ঘরে এসে চিঠি রেখে গেল, প্রায় কান্নাকাটি করে। প্রথমে ওর ওপর খুব রাগ হয়েছিল, কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও কেন জানি না সে রাগকে কিছুতে পুষে রাখতে পারলাম না। আমি জানি আমার সঙ্গে মিশতে ওর নিজের কোনো সংকোচ ছিল না—কিন্তু বিয়ে করা, সে আলাদা কথা, সেখানে সমাজের ভ্রূকুটিকে সে ভয় করেছে। সেখানে আমি খাপছাড়া। যাই হক, প্যারিস আমার চোখে বিষিয়ে উঠেছিল, আমি আবার ইংলণ্ডে চলে এলাম।

সে অনেক দিনের কথা। এর মধ্যে সেইন নদীর সুন্দর সেতুর তলা দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে। অনেকবার এসেছি এ শহরে, আর কখনো ওর সঙ্গে দেখা হয় নি। ওভাবে ওকে হারিয়ে ফেলার কথা ভাবলে এখন একটু হাসিই পায়। ওহে, এবার বরং একটু শ্যাম্পেন আস্বাদ করি এস। শাস্ত্র চুলোয় যাক, এতদিন পরে এমন ভাবে তোমার সঙ্গে দেখা, শ্যাম্পেন না হলে মানায় না। তাছাড়া খেতেও একটু দেরি আছে এখনো।”

হুকুম জানিয়ে দিয়ে মোহনলাল আবার বললে, "এই হল প্রেমের খেলায় আমার হাতেখড়ি। তারপর বুঝতে শিখেছি যে ও খেলায় অন্যান্য খেলার মত পারদর্শিতা আসে ক্রমাগত অধ্যবসায়ে। এ দেশে অন্তত ও মস্ত বড় আর্ট। Love them and leave them নীতি গ্রহণ করে অথচ দু পক্ষেরই চোখের জল এড়িয়ে কি করে শান্তিতে থাকা যায় তা সবাই সহজে শিখতে পারে না।"

আমি বললাম, "তার মানে কোরিনের অভিজ্ঞতার পর থেকে ভালবাসা তোমার কাছে এক indoor game ছাড়া আর কিছু নয়।"

মোহনলাল যেন কি বলতে গিয়ে থেমে গেল। গার্সঁ আমাদের সামনে টলটলে দুটি পাত্র রাখলে। সে চলে যেতে ধীরে ধীরে একটি সিগারেট ধরিয়ে মোহনলাল বললে, "অনেকদিন তাই ছিল, কিন্তু সব ওস্তাদ খেলোয়াড়েরই বোধহয় একদিন না একদিন হাত বেচাল হয়।"

"ওখানে আরেকটা গল্পের গন্ধ পাচ্ছি যেন।"

শ্যাম্পেনে ঠোঁট ঠেকিয়ে মোহনলাল বললে, "আঃ, ঝাঁজের পর মিষ্টিটা বেশ লাগছে। তবে শোন।"

অলগার সঙ্গে আলাপ ইংলিশ চ্যানেলের ফেরিতে। আমেরিকান টুরিস্ট, ইংলণ্ড দেখা শেষ করে যাচ্ছে কন্টিনেন্টে। চোখের উৎসুক দৃষ্টি পুব দিকে নিবদ্ধ, দেখেই বোঝা যায় বহুদিনের প্রতীক্ষা সফল হবার দিন তার আজ। রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে ছিল, সেখানেই আলাপ। নিউ ইয়র্কে শিক্ষয়িত্রী সে, নিজের জমানো টাকায় এবার য়োরোপ দেখতে বেরিয়েছে। আলাপের পর এ পর্যন্ত জানা গেল জাহাজেই।

বললে, "আমি অবশ্য বরাবর য়োরোপ দেখার স্বপ্ন দেখেছি, ঠাকুরমার কাছে গল্প শুনে শুনে। তার জন্ম রাশিয়ায়, তার নামেই

আমার নাম।" তারপর একটু থেমে যোগ করলে, "শুনেছি ওরা আমেরিকানদের পছন্দ করে না।"

"হ্যাঁ, দু চার জায়গায় দেখবে দেয়ালে লিখে দিয়েছে তোমাদের দেশে ফিরে যেতে। সেটা কিছু নয়, ডলারের দাম ওরা ভালই বোঝে। আসলে মুশকিল হয়েছে সাবেক কালের টুরিস্টদের। তোমাদের জন্য তাদেরও এখন সব জায়গায় চড়া দাম দিতে হয়। আর তাছাড়া তারা ভাবে য়োরোপ বেড়িয়ে যদি খালি আমেরিকাই দেখতে হয় তবে সেটা আর য়োরোপ বেড়ানো হল না।"

"দর দস্তুরের ভয় আমার মনেও একটু আছে। এরা হয়তো বিশ্বাস করবে না, কিন্তু আমেরিকায় লাখপতি ছাড়াও দু চারজন লোক খুঁজলে পাওয়া যায় এবং দুর্ভাগ্যবশত আমি সেই দলে। বড় হোটেলে যাবার পয়সা নেই—এই জুলাই মাসে একটা থাকার জায়গা জুটবে তো ?"

একটা প্রস্তাব মুখের কাছে এসেছিল, কিন্তু চুপ করে থাকলাম।

ট্রেনেও পাশাপাশি বসে গল্প করতে করতে এসে গেল প্যারিস। স্টেশন থেকে বেরিয়ে বিদায় নেবার সময় জিজ্ঞাসা করলাম সে কোথায় যাবে এবার। চিন্তিত মুখে এক দিকে হাত দেখিয়ে সে বললে, "দেখি, হাঁটতে হাঁটতে একটা হোটেল পেয়ে যাব।"

একটু ইতস্তত করে যে কথাটা আগে বলব ভেবেছিলাম তা বলে ফেললাম। তখন আমি ঐ চাকরি ছেড়ে দিয়ে নিজেই যন্ত্রপাতির ব্যাবসা আরম্ভ করেছি। কাজটা একই, একজনের মাল আরেকজনকে বেচা। রোজগার খুব ভাল ছিল না, প্যারিসে এলে থাকতাম এক মাঝারি গোছের pensionতে, বুলেভার দ সেবাস্টোপোলের কাছে এক ছোট রাস্তায়। জায়গাটা সস্তা এবং মোটামুটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

বললাম, "আমি যেখানে থাকি সে জায়গাটা খুব খারাপ নয়, ইচ্ছে করলে আমার ট্যাক্সিতে এসে একবার চেষ্টা করে দেখতে পার ঘর খালি আছে কিনা।" ওর মুখে সূক্ষ্ম এক ছায়া পড়ল। তাড়াতাড়ি যোগ করলাম, "অবশ্য জায়গা না পেলে বা ঘর পছন্দ না হলে কাছাকাছি আরো দু চারটে জায়গায় ব্যবস্থা হতে পারে। আমাদের গৃহকর্ত্রীই হয়তো তা বাতলে দেবে।"

এইবার ধন্যবাদ জানিয়ে সে রাজী হল। ঘর পাওয়া গেল, তবে আমেরিকান দেখেই বোধহয় মাদাম লারুস্ ভাড়া চেয়ে বসলেন আটশো ফ্র্যাংক। আমার ঘরটা ওর সঙ্গে বদলাতে চাইলাম, কিন্তু অলগা তা শুনলে না।

জামা কাপড় বদলে সেই যে সন্ধ্যাবেলা বেড়াতে বেরোলাম তা চলল ক্রমাগত পরবর্তী দু সপ্তাহ। তখন আমার হাতে বিশেষ কাজ ছিল না, নিজেকে দিলাম কিছু দিনের ছুটি। সকালে দেরি করে উঠে সামনেই এক দোকানে croisson আর কফি খেয়ে বেড়াতে বেরোনো আর সারাদিন বাইরে বাইরে কাটিয়ে গভীর রাতে পা টিপে টিপে ঘরে ফেরা এই চলল কিছু দিন।

অন্ধকারে বিছানায় শুয়ে কত কথাই মনে হত। এতদিনে আমাদের বন্ধুত্ব বেশ গাঢ় হয়ে উঠেছে—প্রতিদিনই টের পেতাম তা কতটা বেড়েছে—অথচ কেউ কি বিশ্বাস করবে আমি ওর গায়ে হাত দিই নি! আমি নিজেই কি আগে বিশ্বাস করতাম। সত্যি কথা জানলে বোধহয় সবচেয়ে বেশী অবাক হবে মাদাম লারুস্। এর আগে সে দেখেছে আমার বান্ধবীদের—যা ভাবার নিশ্চয় ভেবে নিয়েছে। আর অলগা, সে নিজেও কি ঠিক এমনটা আশা করেছিল! কিন্তু তার বিস্ময়ের সঙ্গে মেশানো কি কৃতজ্ঞতা—না খানিকটা শ্লেষ?

আমারই মত এমনি বিছানায় শুয়ে সে এখন কি ভাবছে আমার

জানতে ইচ্ছে করত। সে কি মনে মনে হাসছে আর ভাবছে লোকটা নিতান্তই অপারগ আর ক্লীব। আমার কিন্তু ভাবতে ভাল লাগত অন্য রকম। ওকে যেটুকু জেনেছি তার থেকে আমার মনে হত ও ভাবছে আমি বিভিন্ন, ঠিক আর দশজনের মত নয়। তুমি নিশ্চয় জান মেয়েদের এক বড় অভিযোগ—যা তারা সদা সর্বদা প্রকাশ করে থাকে—হল 'পুরুষরা সব এক রকম', 'তারা আমাদের কাছে খালি একটা জিনিসই চায়'। আমি কল্পনা করতাম ও যেন ভাবছে এই লোকটা কিন্তু অন্য রকম।

ভুল বুঝো না, আমি আত্মসংযমের বড়াই করছি না বা বলতে চাচ্ছি না যে আমি সাধারণের দলে ছিলাম না। কিন্তু এক্ষেত্রে আমার মনে মনে প্রায় আমার সাধ্যের বাইরেই একটা ইচ্ছে গজিয়ে উঠেছিল নতুন কিছু করার। ওর মধ্যে কি হেতু ছিল এই অদ্ভুত খেয়ালের! এর আগে একবার মাত্র যাকে সবার থেকে আলাদা করে দেখেছিলাম তাকে বারে বারে তুলনায় মনে পড়ত এই সময়টায়। কোরিন ওর চেয়ে সহজে কুণ্ঠাহীন হাসি হাসত, আবার হঠাৎ অগ্নিমূর্তি হয়ে ঝগড়াও করত। সরস, চটুল, ঝাঁজালো মেয়ে সে। অলগার হাসি সহজ কিন্তু কখনো একেবারে নিঃসংকোচ নয়, ও কারো সঙ্গে জোরে কথা বলতে পারে বলে কল্পনা করা যায় না। এক ওর টলটলে চোখ ছাড়া আঙ্গিক সৌন্দর্যে সে কোরিনের খাটো। ওকে কিছু কিনে দেওয়া প্রায় অসম্ভব, খাওয়ার পরে প্রতিবার প্রতিটি সেণ্ট হিসেব করে শোধ দেবে। অথচ জড়তা বা শৈত্যও ওর মধ্যে ছিল না কিছু, বরং সঙ্গে থাকলে সর্বদা মনে হত একটা হৃদয়ের স্পর্শ পাচ্ছি।

প্যারিসে সাত দিন থেকে, দক্ষিণ ফ্রান্স বেড়িয়ে রোমে এলাম দুজনে। সেখানে তিন দিন পরে ছাড়াছাড়ি। আমাকে কাজে

যেতে হবে বেলগ্রেডে, ও যাবে ইনস্ব্রুকে এক জ্ঞাতির বাড়িতে কিছু দিন থাকতে।

আগের দিন সকালে বললাম, "আজ সন্ধ্যায় বিদায় ভোজটা একটু ভাল করে করতে চাই। সস্তা ট্রাটোরিয়াতে বসে স্পাগেটি খাওয়া নয়, এদের যা সবচেয়ে ভাল খাদ্য তাই—সঙ্গে বাছাই করা বর্দো বা বার্গাণ্ডি। কি বল?"

অলগা সাগ্রহে রাজী হল।

বললাম, "নিমন্ত্রণটা আমার। দয়া করে গ্রহণ করলে বিশেষ সুখী হব। অবশ্য ঐ পুরনো কথাগুলি বলে যদি গ্রহণ না কর তবু বন্ধুত্ব টিঁকেই থাকবে—অসুখী লোকের বন্ধুত্ব।"

কিছুক্ষণ ভেবে সে বললে, "হয়তো নিউ ইয়র্কে কোনোদিন এর শোধ দিতে পারব। আচ্ছা আজকের রাত তোমার।"

পরদিন ওর দু ঘণ্টা আগে আমার ট্রেন ছাড়বে। দুজনে একসঙ্গে এলাম স্টেশনে। সেখানে ও কাগজের বাক্স খুলে কেক ও ফল ভাগ করে পরম যত্নে সাজিয়ে দিল আমাকে রাস্তায় খাবার জন্য। কখন যে কিনেছে টেরই পাই নি।

এর আগেই ওর বাড়ির ঠিকানা নেওয়া হয়েছে, এ কদিনের তোলা ছবি পাঠাব বলে। কিন্তু চিঠি লেখার কথা কেউ বললাম না। ট্রেন ছাড়ার আগে দু হাত দিয়ে শুধু ওর ডান হাতখানা ধরলাম। ও ম্লান মুখে একটুখানি হাসল।

গাড়িতে বসে বড়ই একলা লাগতে থাকল। কামরায় আর যারা ছিল মনে হল তাদের এ পৃথিবীতে আসার কোনো দরকার ছিল না। এতদিন যে পাশে পাশে ছিল সে আর নেই, সম্ভবত তার সঙ্গে আর কোনোদিন দেখা হবে না, এ কথাটা কিছুতে বিশ্বাস হচ্ছিল না। ভাবতে লাগলাম জানলার বাইরে তাকিয়ে। এই

বন্ধুত্বের মধ্যে কি আর কিছুই ছিল না! প্রথম দিকে প্যারিসে আমি ওকে যথেষ্ট সুযোগ দিয়েছি একা একা বেড়াবার, নিজের মনে চলার। সঙ্গ নেবার বেশী আগ্রহ দেখালে শুধু দয়া বা কৃতজ্ঞতার বশে ও থাকতে পারে কাছে এই ছিল ভয়। আমাকে এড়িয়ে গেলে পাছে আমি এমন কিছু সন্দেহ করি যা ওর নিজের দেশের লোক ভাবতে পারে না এ আশঙ্কা ওর মনে থাকা খুবই স্বাভাবিক। সেজন্যই আরো সুযোগ দিয়েছি ওকে যেন ইচ্ছে করলে দূরে সরে যেতে পারে। কিন্তু দু তিন দিনের মধ্যেই বুঝতে দেরি হয় নি যে একসঙ্গে বেড়াতে দুজনেরই আমাদের সমান ভাল লাগত। দেখেছি নিজের ছোটখাটো ব্যক্তিগত কাজ সে সর্বদা তাড়াতাড়ি শেষ করে ফিরে এসেছে, অনেক সময় একেবারেই বিসর্জন দিয়েছে। পথে ঘাটে মাঝে মাঝে অন্যান্য আমেরিকানদের সঙ্গে দেখা হয়েছে, কখনো আলাপও হয়েছে; সে ইচ্ছে করলেই তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে সরে যেতে পারত, কিন্তু সে রকম কোনো আগ্রহই দেখি নি।

এমনও হতে পারে যে এ শুধু পথের মিতালি, তার বেশী কিছু নয়। প্রথম থেকেই জানা থাকে যে এ দু দিনের পরিচয়, সুটকেস গোছানোর মত একেও দিন হিসেবে গ্রহণ করতে হবে; তার মধ্যে থাকবে যতটা সম্ভব হাসি, কিন্তু বিদায়ের দিনে চোখের জল তাবলে নয়। বিদেশে একলা মেয়ে, বোধহয় সেজন্যই আমার ওপর এতটা নির্ভর করেছে, কাছাকাছি থেকেছে। তার চেয়ে বেশী অর্থ এর মধ্যে হয়তো থাকতে পারে, কিন্তু যেখানে সন্দেহ আছে সেখানে আমি সাবধানে থাকতে চাই, ভুল করার সম্ভাবনা রাখতে চাই না আর।

প্রায় এক মাস পরে ছবিগুলি পাঠিয়ে দিলাম নিউ ইয়র্কে। সঙ্গে ছিল কয়েক লাইনের চিঠি—আশা করি ওর বাকি বেডানোটা ভালই

হয়েছে এবং ও নির্বিঘ্নে দেশে ফিরেছে। একেবারে শেষে যোগ করলাম, "আমার মনে আছে তুমি একবার কথায় কথায় বলেছিলে যে চিঠি লেখা তোমার কাছে এক ভীতিকর ব্যাপার। সুতরাং যদি এ চিঠির জবাব না পাই আমি কিছু মনে করব না।"

জবাব এল সঙ্গে সঙ্গে। ছবির জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ কয়েক দিনের বেড়ানোর বিবরণ দিয়ে লিখেছে, "রোম থেকে ট্রেনের ঐ লম্বা পাড়ি বড়ই বিরক্তিকর লেগেছিল। যারা ছিল আশেপাশে এতদিনের তুলনায় তাদের সঙ্গ একেবারেই বিরস ঠেকছিল।"... "ফেরার পথে আবার সেই প্যারিস, কিন্তু এবার তার অন্য চেহারা। ঘোলাটে আকাশ, দিনরাত টিপটিপ বৃষ্টি। আমার মনের আবহাওয়ার সঙ্গে তা মিলে গিয়ে আরো খারাপ লাগছিল। সেই বাড়িতেই উঠেছিলাম, কোথাও বেরোই নি, সোজা এসে জাহাজে উঠেছি।"..."ফিরে এসে কিছুতে কাজে মন দিতে পারছি না। তার অর্ধেক রয়ে গেছে য়োরোপে। আবার কবে তাকে দেখব!" তারপর একেবারে শেষে পুনশ্চ দিয়ে, বোধহয় খামটা বন্ধ করার আগে যোগ করেছে, "দেখতেই পাচ্ছ আমার চিঠি লেখার 'সমস্যা' সবার সম্বন্ধে প্রযোজ্য নয়।"

চিঠিটা পড়ে রইল দেরাজের খোপে। অন্যান্য কাগজপত্রের মধ্যে রোজই চোখে পড়ত, মাঝে মাঝে খুলে পড়তাম। কিন্তু কাগজ কলম নিয়ে বসতে ইতস্তত করি। এ জিনিসকে বাড়িয়ে কি হবে! মিষ্টি কথা যা সব লিখেছে তার কিছুটা তো মেয়েদের স্বাভাবিক মধুমাখা ভাষা, কিছুটা 'পাশ্চাত্য ভদ্রতা'—এতদিনেও কি তা আমি বুঝতে শিখি নি। তাছাড়া বেড়িয়ে ফিরে সবারই কিছু দিন মন কেমন করে—ইতিমধ্যে নিশ্চয় সে আবার তার পুরনো জীবনের সঙ্গে সম্পূর্ণ জুড়ে গেছে, আমার চিঠি পেলে হয়তো অবাক হয়ে যাবে।

প্রায় এক মাস পরে তবু লিখলাম একটা জবাব। এমনি করে চলল আমাদের পত্র বিনিময়। তা যেন কাজের ফাঁকে অনেক দিন পরে একটুখানি অবসর ছিনিয়ে নিয়ে নিরিবিলিতে বসে অলস মেজাজে দু দণ্ড এক সুন্দর স্মৃতির কথা ভাবা। ব্যস্ত জীবনে যার কোনো ওজন নেই, অথচ যা অমূল্য, প্রায় একটা বিলাস আজকালের দিনে। নানা দেশের খবর সম্বন্ধে বা কাজের সূত্রে যাদের সঙ্গে দেখা তাদের সম্বন্ধে দু চারটে ছোট ছোট মন্তব্য। কিছু ঘরোয়া কথা, কিছু নতুন বই বা ফিল্মের কথা, এই নিয়ে দু তিন পাতার চিঠি। সব কিছুর মধ্যে এক সূক্ষ্ম তারল্যের সুর, বন্ধুত্বের অনুভূতি। এই সাগরলঙ্ঘী পত্রালাপের কথা ভেবে মাঝে মাঝে আমার (এবং নিশ্চয় ওরও) বেশ অবাক লাগত। সাধারণত চোখের থেকে দূরে সরে এলে মনও বিদায় দিতে দেরি করে না। এ যাবৎ আমরা পরস্পরকে মিস ও মিস্টার বলেই ডেকেছি, এক চিঠিতে ও সম্বোধন করলে আমার নাম ধরে (ঠিকানা বদলের সময় ওর খাতায় পুরো নাম লিখতে হয়েছিল), বললে এতদিন পরে ঐ সম্মানিত সম্বোধন বড়ই আড়ষ্ট ও বেমানান। দু একবার মনে করিয়ে দিলে যে ওর সঙ্গে আমেরিকায় ডিনার খাওয়ার আমার এক নিমন্ত্রণ আছে। আমি এত দেশ ঘুরি, একবার কি আমেরিকায় আসতে পারি না, আমার যন্ত্র-পাতির থেকে এমন ভাবে তার দেশকে বঞ্চিত করছি কি রাগে। ও জানে না যে আমেরিকা যন্ত্রের রাজা, য়োরোপের থেকে কেনার তার কিছুই নেই। আর তার থেকে কেনার ডলার নেই য়োরোপের। তাছাড়া অত দূরে ব্যাবসা খুঁজতে যাওয়ার মত পয়সাও তখন আমার ছিল না।

প্রায় দেড় বছর চলে গেল এমনি করে। ইতিমধ্যে অবস্থা অনেকটা সচ্ছল হয়েছে আমার, মাদাম লারুস্‌কে ছেড়ে নদীর বাঁ পারে

St. Germain-des-Prés অঞ্চলে আমার এই ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়েছি। অনেক দিন ওর খবর পাই নি। এক কনকনে শীতের সন্ধ্যায় ঘরে ফিরেই তাড়াতাড়ি আগুনের কাছে বসে সেদিকে অসাড় হাত দুটো বাড়িয়ে দিয়েছি, বাইরের অবিশ্রান্ত আধ-জমা বৃষ্টিতে দেহ মন ক্লান্ত, হঠাৎ আগুনের আভায় অন্ধকারের মধ্যে চোখে পড়ল পাশের টেবিলে একটা খাম। টেবিল বাতিটা জ্বেলে পড়লাম নতুন খবর। অলগার বিয়ে ঠিক হয়েছে। ওরই স্কুলে কাজ করে ছেলেটি, অনেক দিনের আলাপ, বেশী দিন বাগ্‌দত্ত থাকবে না তারা, নতুন বছরেই বিয়ে। আরো কি কি যেন লিখেছিল ভাবী স্বামীর সম্বন্ধে। চিঠিটা রেখে দিয়ে বাতি নিভিয়ে দিলাম। আগুনের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে মনে হল এই ভাল, সব দ্বিধার শেষ হয়ে গেল, যা একদিন আসবেই তা এসে গেল।

মাসখানেক পরে কাজে গিয়েছিলাম জেনিভাতে। সেখান থেকে একটা ভাল ঘড়ি কিনে আমার শুভেচ্ছার সঙ্গে পাঠিয়ে দিলাম ওকে। জবাব এল অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে, নায়াগ্রা প্রপাত থেকে, সেখানে হানিমুনে গেছে ওরা। কিন্তু এই চিঠিতে সে স্বামীর কথা প্রায় কিছুই লেখে নি, বোধহয় আমি কিছু জানার আগ্রহ দেখাই নি বলে। চিঠি প্রায় আগের মতই অন্যান্য প্রসঙ্গে ভরা ছিল। পড়ে মনে হয় যেন ওর চোখে আমাদের বন্ধুত্ব মোটেই ব্যাহত হয় নি বিয়েতে, যেন স্বামীর কাছে ও আমার কথা সবই বলেছে এবং তার কোনো আপত্তি নেই।

সে যাই হক, আমার আর চিঠি লিখতে ইচ্ছে হল না। মনে হত আমাদের নিজস্ব কথোপকথন কে যেন কান পেতে শুনবে—সেটা আমি বরদাস্ত করতে পারব না। আর কথা বলার আগ্রহও কেমন যেন শুকিয়ে গেল।

হঠাৎ সেবার মে মাসে নিউ ইয়র্কের এক কোম্পানির থেকে এল এক বিশেষ লোভনীয় প্রস্তাব; তাছাড়া ওখানে আরো কয়েকটা জায়গায় অনেক দিন থেকেই ছিল কিছু কিছু আশা, তাই ঠিক করে ফেললাম আমেরিকা যাওয়া। ভেবেছিলাম অলগাকে জানাব না, কিন্তু নিউ ইয়র্কে পেঁৗছে ঐ প্রকাণ্ড অচেনা শহরে বড়ই একা একা লাগল। মনে পড়ল ওর কাছে প্রতিজ্ঞা আছে এখানে এলে ওর নিমন্ত্রণ খেতে হবে। তাছাড়া এত কাছে এসেও ওকে একবার দেখব না—কি দোষ তাতে!

টেলিফোনে আমার পরিচয় শুনে বিস্ময়ে ওর গলায় কিছুক্ষণ কথা মরে গেল। তারপর কেন আমি আগে জানাই নি তার কৈফিয়তে আমতা আমতা করে পরদিন সন্ধ্যায় ওদের বাড়িতে খেতে যাবার কথা দিতে হল।

পরদিন ছটায় ওএস্ট ১২ স্ট্রীটে এক অট্টালিকার আটতলায় উঠে দরজার বোতাম টিপলাম। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দরজা খুলে গেল, অলগার চোখে আনন্দের সঙ্গে অবিশ্বাসের ভাবটা যেন তখনো লেগে রয়েছে, পিছনে সহাস্য মুখে ওর স্বামী দাঁড়িয়ে।

ঘরে বসে ওর স্বামী বললে, "বাড়ি চিনে বার করতে কষ্ট হয়নি তো?"

অলগা বলে উঠল, "এ দেশে তা হবার উপায় নেই, নম্বর দেওয়া সরল সমান্তরাল রাস্তা, এ তো আর য়োরোপ নয়।"

বললাম, "তাই তো দেখছি, যদিও এর মধ্যেও খুঁত রয়েছে কিন্তু। তৃতীয় ও চতুর্থ অ্যাভিনিউর মধ্যে হঠাৎ লেক্সিংটন অ্যাভিনিউ এসে পড়ল কি অধিকারে। ম্যাডিসন অ্যাভিনিউ, পার্ক অ্যাভিনিউ, ব্রডওএ এগুলিও তো নম্বরী নাম নয়। তারপর পঞ্চম আর সপ্তমের মধ্যে ষষ্ঠ রাজপথ হঠাৎ কি গুণে অ্যাভিনিউ অব দি আমেরিকাজ নাম পেল তাও বাইরের লোকে বুঝতে পারে না।"

অলগা হেসে বললে, "কিন্তু যাই বল আমার কিন্তু য়োরোপের ঐ আঁকাবাঁকা পাথর বসানো রাস্তা বেশ লাগে। এতদিন হয়ে গেল এখনো য়োরোপ ভুলতে পারছি না।"

শেরির পাত্র হাতে তুলে দিতে দিতে ফ্রেড বললে, "অলগার য়োরোপ ছাড়া আর কথা নেই। মাঝে মাঝে আমার ভয়ানক হিংসে হয় য়োরোপের ওপর।"

কথাটা শুনে ভাল করে তাকিয়ে দেখলাম লোকটির মুখের দিকে। মনে মনে প্রশ্ন হল অলগা ওকে কি বলেছে, কতটুকু বলেছে আমার কথা! কিন্তু কি করে জানব। ছেলেটির বয়স ওরই কাছাকাছি হবে মনে হয়, মুখে একটা হাসির ভাব লেগেই আছে। আর অলগা, আগের তুলনায় তাকে যেন একটু ক্লান্ত মনে হল।

খেতে বসে সেদিন কথায় কথায় বলেছিলাম যে এক য়োরোপীয় প্রতিবেশিনীর জন্য আমার কিছু জামা কাপড় কেনার হুকুম আছে। অলগা বললে সে আমায় সাহায্য করবে, ঠিক হল দু দিন পরে ওকে তুলে নেব ১১৬ স্ট্রীটে ওর স্কুল থেকে।

সেদিন ট্যাক্সিতে উঠে ড্রাইভারকে দোকানের ঠিকানা দিয়ে অলগা বললে, "কেমন আছ ?"

"ভাল। তোমাকে আর ও প্রশ্ন করব না, দেখতেই পাচ্ছি তুমি খুব ভাল আছ।"

অলগা শুধু হাসল। একটু পরে নিজের বাঁ হাতের কব্জিটা তুলে ধরে বললে, "চিনতে পারছ ?"

বললাম, "কেমন চলছে ?"

"মোটেই ভাল না। সময়ের এক চুলও এদিক ওদিক হবার উপায় নেই। আমার মনে হয় ঘড়িদের কখনো জোরে কখনো আস্তে চলা উচিত।"

"যেমন ?"

"যেমন শীতের রাতে লেপের তলায় আস্তে চলবে, আবার ছুপুরে একটা বাজার একটু পরেই আপিশ ছুটি করে দেবে।"

"তাতে তোমাদের স্বভাবের সঙ্গে মানাত সন্দেহ নেই, কিন্তু ছুনিয়া অচল হয়ে যেত।"

কেনাকাটি শেষ হলে রাস্তায় বেরিয়ে বললাম, "কোথাও বসে একটু চা খেলে হত না ?"

মহানগরে তখন বেলাশেষের প্রহর। আকাশে অবশ্য তখনো যথেষ্ট আলো, কিন্তু আপিশ-ফেরত ব্যস্ত লোকের ভীড় কমে গেছে, রাস্তায় আর ছুটোছুটি নেই। দেড় ঘণ্টা আগের তুলনায় পাড়া অনেক নিরিবিলি।

কাছেই এক রেস্তরাঁতে ঢুকলাম। দোকানের আলো স্তিমিত, লোকজন বেশী নেই। ছুটি যুবক দূরে দাঁড়িয়ে দোকানদারের সঙ্গে গল্প করছে। পরিবেশিকা ছু গ্লাস বরফ জল সামনে রেখে জিজ্ঞাসা করলে কি চাই। ওর জন্য মিল্ক শেক আর আমার জন্য ঠাণ্ডা চায়ের আদেশ নিয়ে সে চলে যেতে বললাম, "য়োরোপের থেকে যারা এ দেশে আসে তাদের সবচেয়ে বড় কি অসুবিধা হয় জান ? গলা ভেজাতে হলে সাধারণ রেস্তরাঁতে কোথাও মদিরার সাক্ষাৎ মেলে না।"

সে বললে, "তেমন আমাদের এখানে ঠাণ্ডা জল কত সহজে পাওয়া যায়, আর য়োরোপে তা প্রায় অ্যালকহলের চেয়েও ছুষ্প্রাপ্য। মানুষ তো মাঝে মাঝে জলও খায়। তারপর এ দেশটা কেমন লাগছে বল। আমাদের যন্ত্রপাতিগুলি অন্তত তোমার চোখে ভাল লাগছে।"

"হ্যাঁ, প্রায় তাক লেগে গেছে বলতে পার। রেল স্টেশনে নেমে দেখি বাক্স জমা দেবার জন্য আপিশে যাবার দরকার নেই, ব্যক্তিগত

সিন্ধুকের সারি সাজানো আছে। সুটকেস হাতে করে বেরোতে গিয়ে আপনা থেকে দরজা খুলে গেল। ডাকবাক্সে পয়সা দিয়ে চিঠি ফেললে সে-ই টিকিট লাগিয়ে দিচ্ছে। রান্নাঘরের আর মোটর গাড়িরই বা কত যন্ত্র সমন্বয়। ট্যাক্সিতে অধুনাতম রেডিও-টেলিফোন ব্যবস্থা, গাড়ির ভিতরে শীতকালে গরম আর গ্রীষ্মকালে ঠাণ্ডা। এ দেশে সবই ইলেকট্রিক।"

"হ্যাঁ আমাদের চেয়ারটা পর্যন্ত," অলগা বললে। "এর কিছু কিছু য়োরোপে নিয়ে যাবে নাকি?"

"হায়, ওদের সে ডলার কোথায়। আমার কিন্তু মনে হয় এ রকমই ভাল। য়োরোপ যদি বেশী আধুনিক হয়ে পড়ে তবে তার জাত যাবে।"

"আবার কবে দেখব য়োরোপ!" অলগা আন্‌মনে বললে।

"সেবারে রোমে মনে করে ত্রেভি ফোরায়ায় পয়সা ফেলেছিলে, নিশ্চয় আবার দেখা হবে।"

অলগার মুখে হাসি ফুটে উঠল, বললে, "মনে পড়ে ঐ বাচ্চা ছেলেগুলো জলে ডুবে ডুবে কেমন পয়সা কুড়িয়ে আনছিল। আমার মনে হয় ইটালিতে এক দল ছেলে আছে যারা শুধু টুরিস্টদের থেকেই জীবিকা অর্জন করে, এমন কি হয়তো সংসারও চালায়। এরা যোগাড় করে দিতে পারে না এমন জিনিস নেই বোধহয়।"

বললাম, "নিউ ইয়র্কের পথে জুতো পালিশওলা ছেলেদের দেখে আমার ঐ ইটালিয়ান বাম্বিনোদের মনে পড়ছিল। দু একজনের সঙ্গে কথা বলে জেনেছি তারা অনেকেই স্কুলের ফাঁকে ফাঁকে জুতো পরিষ্কার করে দু পয়সা রোজগার করে।"

অলগা তখনো ইটালির স্বপ্ন দেখছে, বললে, "রোমের পথে পথে ঐ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ফোয়ারা আমাকে মুগ্ধ করেছে। ফোয়ারা

অনেক শহরেই দেখেছি, আমাদেরও আছে, কিন্তু ঐ রকম সুন্দর কোথাও না।"

"ইটালির ও একটা বিশেষত্ব মনে হয়। ওদের ছোট ছোট গ্রামেও দেখা যায় fontana pubblica, সেখানে জড় হয় পাড়ার মেয়েরা জল নিতে, কাপড় কাচতে, গল্প করতে।"

"মুশকিল হয় ওদের টাকা নিয়ে। ধাতুর মুদ্রা চোখে দেখা যায় না, খুব ছোট থেকে আরম্ভ করে প্রকাণ্ড নোট পর্যন্ত একতাড়া বয়ে বেড়াতে হয়। তাও ঐ রকম শতছিন্ন, আঠা-দিয়ে-সাঁটা নোট জগতে আর কোথাও মেলে না। আর অসুবিধে হত ইংলণ্ডে। দশমিক নিয়ম না থাকার জন্য খুচরোর হিসেব করতে মাথা ঘুরে যেত। কিন্তু কি গর্ব ওদের ঐ সৃষ্টিছাড়া নিয়ম সম্বন্ধে। তাও দেখ পাউণ্ডের পরেও আবার বানিয়েছে একুশ শিলিঙের গিনি।"

"এ দেশে অবশ্য পয়সার হিসেব সহজ, কিন্তু পঁচিশ সেণ্ট্‌কে two bits কেন বল বলতে পার? সব দেশেই আছে কতগুলি অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য যা অন্যের চোখে পাগলামি। না থাকলে বোধহয় দেশ বেড়ানোর আনন্দ কমেই যেত। দেখ না, শুধু কফি খাওয়ারই কত রীতি দেশে দেশে: সাদা বা কালো, ঠাণ্ডা বা গরম, কড়া বা মৃদু, এক্সপ্রেস বা সাধারণ; ইংলণ্ডে তো কফির জাতই মরে গেছে। তারপর তোমাদের এখানে দেখছি অনেকে ডিনার আরম্ভ করার আগেই কফি চায়।"

"আমারও তাই পছন্দ। মনে আছে য়োরোপে সে নিয়ম নেই দেখে খুব অদ্ভুত ঠেকেছিল। তবু তো য়োরোপ আমাদের কাছাকাছি। আরো দূরে গেলে, ধর তোমাদের দেশে, নিশ্চয় আরো কত আশ্চর্য জিনিস দেখব।" একটু থেমে অলগা যোগ করলে,

"আমার অনেক দিন থেকে ইচ্ছে ছিল পুবের জগতটা একবার দেখব, বিশেষ করে ভারতবর্ষ। কিন্তু এত দূর।"

"আজকাল তো সব দেশ দু দিনের দৌড়ের মধ্যে এসে গেছে, গেলেই যাওয়া যায়।"

অলগার চোখ চকচক করে উঠল। কিছু বললে না সে, একটু অন্যমনস্ক হয়ে বসে রইল।

ভ্রমণের পথে আমাদের প্রথম পরিচয়, সুতরাং আশ্চর্য নয় যে য়োরোপের গল্পেই আলাপ জমে উঠবে দুজনের মধ্যে। কিন্তু ভাবলে অবাক লাগে যে সেদিনের প্রত্যেকটি তুচ্ছ কথা আজো এমন পরিষ্কার মনে আছে।

খাওয়া ততক্ষণে শেষ হয়ে গেছে, হাতের দেশলাইটা নিয়ে খেলা করতে করতে হঠাৎ বললাম, "জান অলগা, এক সময় আমি তোমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলাম ভয়ানক। তোমার সঙ্গে আলাপের কিছু দিন পর থেকেই। জানি এ খবর তোমাকে অবাক করে দেবে।"

অলগার মুখ কালো হয়ে গেছে। শুকনো গলায় বললে, "এ ঠাট্টা আমার ভাল লাগল না।"

"থাক তাহলে ঐ প্রসঙ্গ মরল এখানেই। তবে ঠাট্টা নয়, একেবারে মনের কথা—আসলে এমন সত্যি কথা আমি জীবনে কমই বলেছি। এটাও হয়তো কোনোদিন বলতাম না, কিন্তু এখন আর তোমার ভয়ের কি আছে, এখন তুমি বিবাহিত, বিয়ের পর এমন অনেক কথা বলা চলে যা আগে চলত না—"

"চুপ কর, দোহাই তোমার," অলগার চাপা সুরের তিরস্কার আমাকে একেবারে থ বানিয়ে দিল। দেখি দু হাতে মুখ ঢেকে সে টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়েছে, কোনো সাড়া নেই, শুধু মাঝে মাঝে দেহ কাঁপছে অল্প অল্প।

জীবনে এমন অপ্রস্তুতে কখনো পড়ি নি। নিজের মধ্যে ভীষণ সংকুচিত হয়ে গেলাম। এতক্ষণের সরস আলাপের এই পরিণতি মোটেই আশা করি নি। কি করব ঠিক করে উঠতে পারলাম না অনেকক্ষণ। তারপর আস্তে আস্তে বললাম, "অলগা, আমাকে মাপ কর যদি দোষ করে থাকি। তুমি শিক্ষিতা বুদ্ধিমতী মেয়ে—তুমি ভেবে বসলে আমি তোমাকে প্রেম নিবেদন করছি! এতদিন পরে—এত রাত পরে—আজ তুমি ভাবতে পারলে আমি তোমায় অপমান করতে পারি? চল তোমায় বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি।"

অলগা আস্তে আস্তে হাত সরালে মুখ থেকে। ঐ চেহারা ওর আগে কখনো দেখি নি। বললে, "দুনিয়ায় তোমার মত বোকা আর দুটি লোক আছে কিনা জানি না। মাপ কর, কিছুক্ষণ আমি বড় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম—চল যাবে কি এবার?"

কিন্তু তখন আমার হাত পা দেখতে দেখতে পাথরের মত নিশ্চল হয়ে পড়ছে। প্রায় আধ মিনিট শুধু চেয়ে রইলাম ওর দিকে, বিস্ময়ের বুদবুদগুলি যখন একে একে মরে গেল মনে, অনেক প্রশ্ন অনুচ্চারণে ফিরে গেল ঠোঁটের কাছ থেকে, তখন শুধু বললাম, "তুমি বলতে চাও—"

অলগা টেবিলের দিকে চেয়ে মাথা নিচু করলে অল্প একটু।

"কিন্তু ফ্রেড, তাহলে সে কি করে—"

"তার সঙ্গে আজ আমার পাঁচ বছরের আলাপ, পাঁচ বছর ধরেই সে বিয়ের প্রস্তাব করছে।"

দোকানে কে যেন পাঁচ সেণ্ট্ ফেলেছে গানের কলে। রোজমেরি ক্লুনির রুক্ষ-মিষ্টি গলার কাকুতিতে ঘর ভরে গেছে: 'আমার সঙ্গে এস ঘরে···সবই আমার তোমার তরে'। দুজনে টেবিলের দিকে

চেয়ে স্থির হয়ে বসে আছি। গত দু বছরের কত কথা, কত সন্দেহের মুহূর্ত, কত আশা কত দ্বিধা মনের মধ্যে ফিরে এল আর গেল দ্রুত।

গানের কথা কানেই বাজছিল, মর্মে ঢুকছিল না, তবু যন্ত্র নীরব হতে অবশেষে চমক ভাঙল। বললাম, "কিন্তু অলগা, কোনোদিন আমায় একটু বললে না কেন?"

"যদি কোনোদিন আমার চিঠিগুলি ভাল করে পড়তে তাহলে ও কথা বলতে না। তোমার দিক থেকে কোনো সাড়া না পেয়ে ভেবেছি—"

"কি ভেবেছ?"

"ভেবেছি যদিও বা তুমি···যদিও বা তুমি চেয়ে থাক আমাকে, আমি বিজাতি বলে সম্ভব নয় বিয়ে। শুনেছি তোমাদের সমাজে বাধা আছে এতে। কিন্তু তুমি—তুমিও তো কিছু বলতে পারতে।"

"আমি!" আমার ভিতর থেকে, অনেক দূর থেকে, কে যেন বললে, "আমিও তোমার সম্বন্ধে অনেকটা ঐ কথাই ভেবেছিলাম।"

পরিবেশিকা এসে বাসনপত্র সরিয়ে বিল রেখে গেল। পকেট থেকে পয়সা বার করে রাখতে যেন অনেকটা সময় লাগল। তারপর বললাম, "তাসের হাত আমার বরাবরই ভাল, আগেই বোঝা উচিত ছিল।"

অলগা ভ্রূকুঞ্চন করে বললে, "কি করে তুমি এ নিয়ে রসিকতা করতে পার!"

"অভিজ্ঞতার একটা গুণ এই অলগা যে তেতো জিনিস মুখে নিয়েও তা হাসতে শেখায়। চল তোমায় পৌঁছে দিয়ে আসি।"

"চল এবার আমাদেরও ওঠার সময় হয়েছে," বলে মোহনলাল পকেট থেকে একটা নোট বার করে রাখলে টেবিলে। "এখানে খাবার ভাল দেয় না, কিন্তু কাছেই এক রেস্তরাঁ আছে, তাদের চমৎকার বুইয়াবেইস তোমাকে চাখাতে চাই।"